~~4776~~

~~Roll No - 27~~

State Institute of Education
P.O. Banipur, 24 Parganas.
West Bengal.

State Institute of Education
P.O. Banipur, 24 Parganas,
West Bengal.

4776

14/305

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BAN

[শিশু-উপন্যাস]

4776

যকের ধন, কিং কং, আবার যকের ধন, জয়ন্তের কীর্ত্তি, দেড়শো খোকার কাণ্ড,
ময়নামতীর মায়াকানন, যাদের নামে সবাই ভয় পায়, সন্ধ্যার পরে
সাবধান! মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন, অমাবস্যার রাত
প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

State Institute of Education
P.O. Banipur, 24 Parganas,
West Bengal.

জ্যৈষ্ঠ
১৩৫৯

কুলজা সাহিত্য-মন্দির

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

~~7067~~
6267

[দাম পাঁচ সিকা]

কুলজা সাহিত্য মন্দির সি ৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সাধারণ প্রেস লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

4776

'হিমাচলের স্বপ্ন' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা শিশু-উপন্যাস। চিড়িয়াখানার পলাতক একটি ভালুক হচ্ছে এর নায়ক। পাঁচ-ছ' বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বুড়ো-বুড়ী সকলে সমান আগ্রহে বইখানা পড়বেন,—বিষয় বস্তু ও বর্ণনা-মাধুর্য্য এমনি চিত্তাকর্ষক!

ত্রিশ বছরেরও আগে 'যকের ধন' লিখে হেমেন্দ্রকুমার কিশোর উপন্যাসের সূচনা করেন। এর পর যকের ধনের অনুকরণে বহু বই বেরিয়েছে, কিন্তু আজও যকের ধনের প্রচার ও প্রভাব তেমনি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। হিমাচলের স্বপ্নও তেমনি চিরদিন শিশু-মহলের সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের বয়স মোটামুটি ১০০ বছর ধরা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে বহু ক্ষমতাশালী লেখক ও প্রকাশক পূর্ব্বাচার্য্যদের অনুসরণ করে আমাদের ঐ সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চাইতে উন্নত হলেও বিদেশের সঙ্গে তুলনায় এ-সাহিত্য আজও শিশুই রয়ে গেছে। দীর্ঘকাল আগে একদিন স্বর্গীয় সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয় আক্ষেপ করে বলেছিলেন "এ দেশে শিশু-সাহিত্য প্রচারের ভার ও দায়িত্ব যাঁদের উপর, দুঃখের বিষয় তাঁরা এ বিষয় তত মনোযোগ দেন না।" কিন্তু সে ছিল বিদেশী শাসনের যুগ। পরিতাপের বিষয়, আজও সে ধারার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পুস্তকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও ছেলেমেয়েদের হাতে নিঃসঙ্কোচে তুলে দেবার মত বইএর সংখ্যা আজও অতি অল্প। আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে রুচির মর্য্যাদা রক্ষা করা যে শিশু-সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য, তা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। শিশু-সাহিত্য নামে আজ যে সব বই চলছে, তার অধিকাংশকেই "মলাট এবং কমিশন-সাহিত্য" বলা চলে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে বই তুলে দেবার যে দায়িত্ব, আমাদের লেখক এবং প্রকাশকদের অনেকেই সে সম্বন্ধে তেমন সচেতন নহি। এমন কি শিক্ষাবিভাগ অনুমোদিত এমন সব বই দেখা যায়, যাতে মনে হয় তাঁরা হয় কোন মনোযোগ দেন না, অথবা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ক' বছর আগে "শিশুসাহিত্য-পরিষদ" নামে একটা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাঁরা ইচ্ছা করলে একটা অনুমোদিত শিশু ও কিশোর সাহিত্যের তালিকা প্রকাশ ও প্রচার এবং শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য লেখকদের উৎসাহ দিয়ে এ বিষয়ে অনেক কাজ করতে পারতেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম প্রথম কিছু কাজ করলেও এখন এঁরা বছরে একটা মাত্র উদ্যান-সম্মিলনী অনুষ্ঠান করেই নিজেদের কর্ত্তব্য, আনন্দ এবং প্রচার সম্পন্ন করেন।

দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের আজ এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

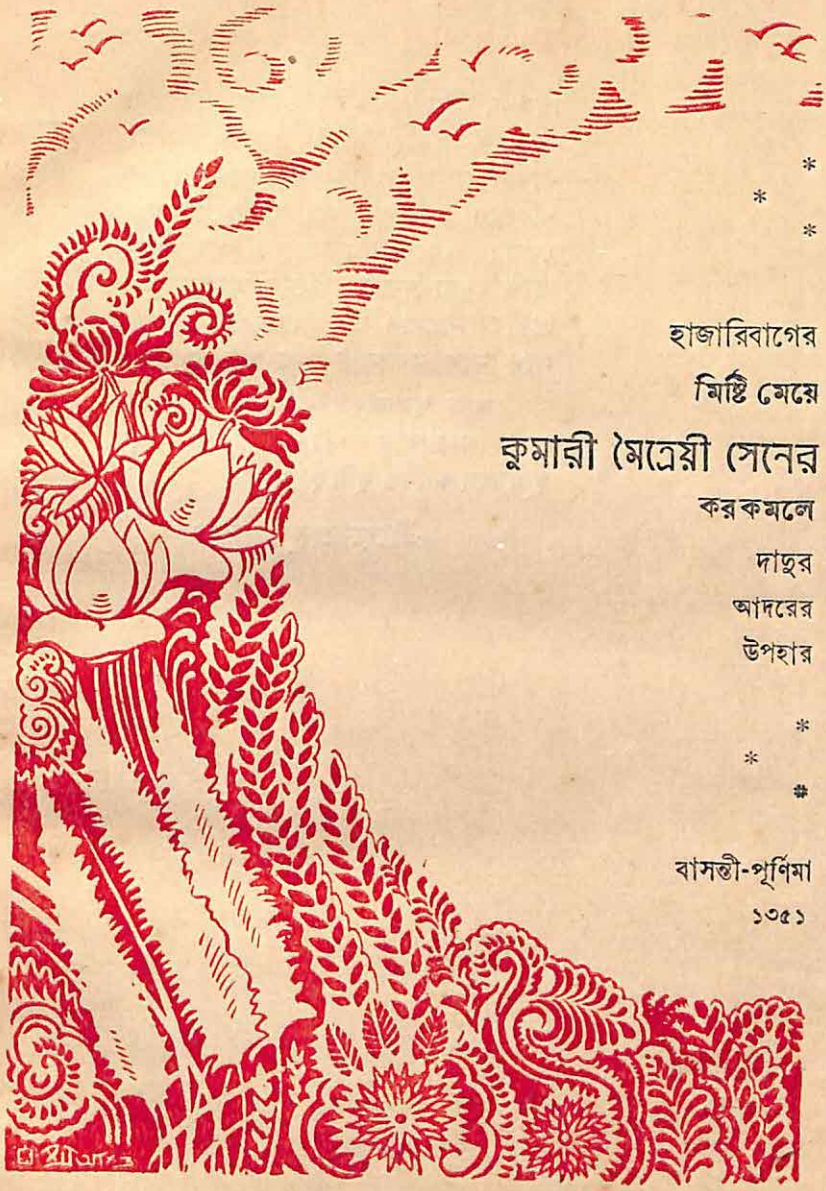

*
*
*

হাজারিবাগের

মিষ্টি মেয়ে

কুমারী মৈত্রেয়ী সেনের

করকমলে

দাদুর

আদরের

উপহার

*
*
*

বাসন্তী-পূর্ণিমা

১৩৫১

শিশু-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক মাসপয়লা সম্পাদক শ্রীমান্ ক্ষিতীশ ভায়ার উৎসাহে তাঁর সম্পাদিত বাংলার প্রথম শিশু-সাপ্তাহিক রবিবারে প্রকাশের জন্য 'হিমাচলের স্বপ্ন' লেখা। প্রকাশকালে সপ্তাহের পর সপ্তাহ নাকি ছেলে-মেয়েরা বিশেষ আগ্রহে এর প্রতীক্ষা করতো। রবিবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল।

আজ পুস্তকাকারে বেরুলো। আমার সেই আগ্রহমান পাঠক-পাঠিকারা পড়ে খুসি হলে আমিও খুসি হব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা
১৩৫১

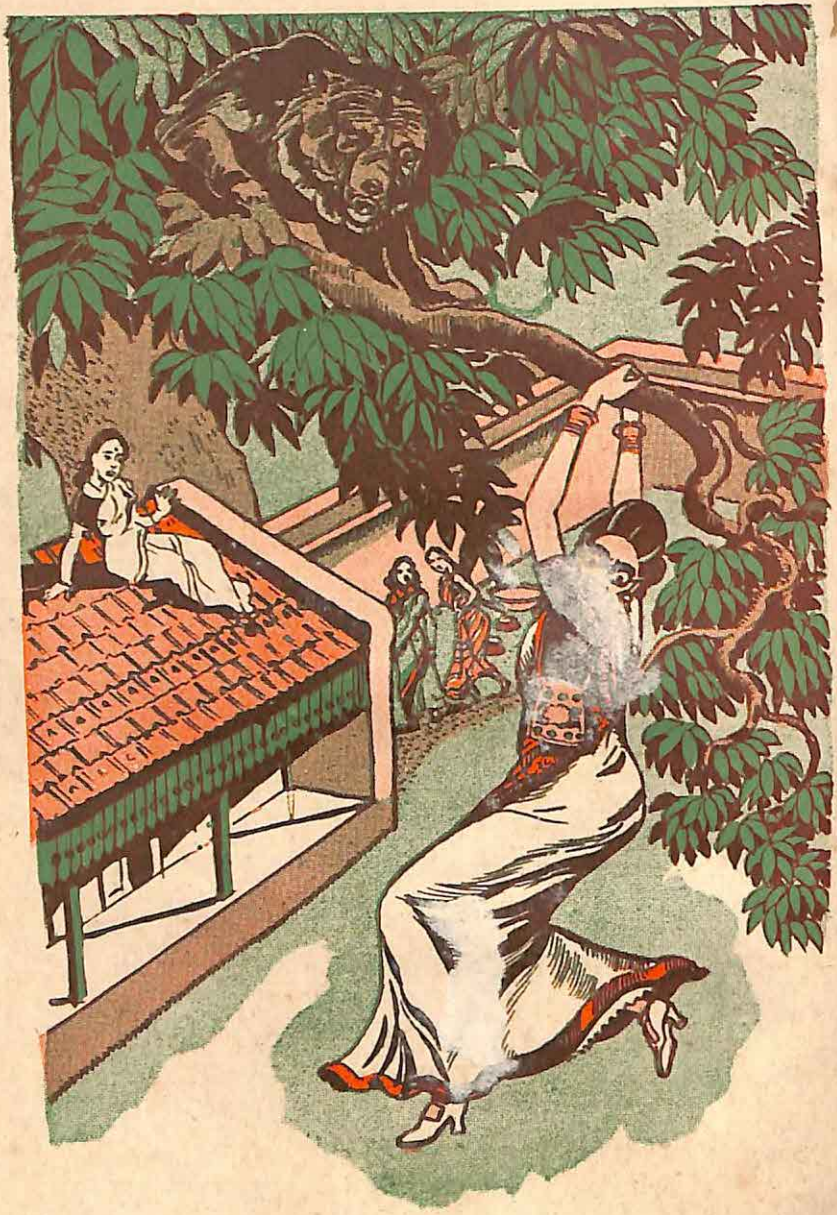

আর কোন উপায় না দেখে মিসেস্ দস্তিদার ডাল ধরে ঝুলে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যা থাকে কপালে—

২৫ পৃষ্ঠা

এক
পথের নেশা

একদিন এক খোকাবাবু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ বাবা, এ কে ?"

খোকার বাপ বললেন, "ভাল্লুক।"

খোকার মুখ দিয়ে বোধ হয় "ক" বেরুলো না। সে নিজের ভাষায় সংশোধন ক'রে নিয়ে বললে, "ভাল্লু !"

সেইদিন থেকে সবাই তাকে "ভাল্লু" ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে।

ভাল্লু জন্মেছিল হিমালয়ের জঙ্গলে, সুতরাং বুঝতেই পারছ, সে হচ্ছে রীতিমত বড়-ঘরের ছেলে! ভল্লুক-বংশে যারা কুলীন ব'লে মর্য্যাদা পায়, তাদের সকলেরই জন্ম গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে।

ভাল্লু যখন মায়ের দুধ ছাড়ে নি, সেই সময়ে হঠাৎ সে এক শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। তারপর শিকারী তাকে যার কাছে বেচে ফেলে, তার ব্যবসা ছিল ভাল্লুক আর বাঁদরের খেলা দেখানো। তার কাছে থেকে ভাল্লুও নানান-রকম খেলা শিখলে—এমন-কি 'ওরিয়েণ্টাল ডান্স্' পর্য্যন্ত। লোকে তার বুদ্ধি আর খেলার কায়দা দেখে বাহবা দিত ঘন ঘন।

তা ভাল্লু যে বিশেষ বুদ্ধিমান হবে, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা নয়। তার অমর ও ভারতবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের নাম কে না জানে? জাম্ববান ছিলেন বানররাজ সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী এবং অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধসভার একজন প্রধান সভ্য। জাম্ববানের বীরত্ব, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং কুস্তি লড়বার ও চপেটাঘাত করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত তাঁর জামাই না হয়ে পারেন নি।

যে লোকটা ভাল্লুকে নিয়ে দেশে দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াত হঠাৎ সে মারা পড়ল। চার বছর বয়সে ভাল্লু বেচারী হ'ল আবার অনাথ। সেই সময়ে কে তাকে নিয়ে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ভর্ত্তি ক'রে দেয়। আজ এক বছর সে চিড়িয়াখানায় বাস করছে।

কিন্তু চিড়িয়াখানা তার মোটেই পছন্দ হ'ত না। বরাবর দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানো তার অভ্যাস, এইটুকু একটা লোহার রেলিং-ঘেরা কুঠুরীর ভিতরে দিন-রাত অলসের মতন ব'সে থাকতে তার ভাল লাগবে কেন? বিশেষ, ভাল্লু হচ্ছে একটি বড়-দরের আর্টিষ্ট। কত কষ্ট ক'রে সে দুর্লভ নৃত্যবিদ্যা শিখেছে—অথচ এখানে কেউ তাকে ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে নাচ দেখাতে বলে না। মাঝে মাঝে নাচবার জন্য তার পা দুটো নিস্‌পিস্‌ ক'রে উঠত, কিন্তু সঙ্গতের অভাবে তার ইচ্ছা হ'ত না পূর্ণ।

রোজই খোকা-খুকীর দল তার ঘরের সামনে এসে কৌতূহলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকত। ভাল্লু রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিজের ভাষায় বলত, "ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!" অর্থাৎ—"হে খোকা-খুকীগণ,

তোমরা কেউ একটা ডুগ্‌ডুগি নিয়ে আসতে পারো ?”

কিন্তু মানুষের ছেলে-মেয়েরা ভল্লুক-ভাষা বুঝতে পারত না, তারা ভাবত সে বোধ হয় খাবার-টাবার কিছু চাইছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভিতরে এসে পড়ত কলা বা ছোলা বা অন্য কোনরকম সস্তা-দামের ফল-মূল।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত, মানুষদের ছেলে-পুলেরা আর্ট বোঝে না, ললিত কলার চেয়ে চাঁপা কলার দিকেই তাদের বেশী টান!

মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। সেই বিরাট হিমালয়! তুষার-মুকুট উঠেছে তার নীলাকাশের অসীমতায়, শিখরের পর শিখরের আশপাশ দিয়ে সাদা সাদা মেঘেরা ভেসে ভেসে যাচ্ছে তাকে প্রণাম ক'রে! নীচের দিকে দুলছে তার গভীর অরণ্যের সবুজ অঞ্চল—সেখানে মিষ্টি গান গাইছে কত পাখী, আতরের ভুরভুরে গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে কত ফুল, রংচঙে টুকরো উড়ন্ত ছবির মতন ঘোরাফেরা করছে কত প্রজাপতি! জঙ্গলের বুকের ভিতরে

আলো-আঁধার মাখা রহস্যময় স্বপ্নপুর, তারই মধ্যে ছিল তার সুখের বাসা !

ভাল্লু একদিন খাঁচার এককোণে উপুড় হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবছে, এমন সময়ে তার রক্ষক এসে খাঁচার দরজা খুললে।

ভাল্লু মানুষদের অত্যন্ত পোষ মেনেছিল। তার চেহারা ছিল প্রকাণ্ড এবং তার লম্বা লম্বা দাঁত-নখ দেখলে সকলেই ভয় পেত বটে, কিন্তু যারা তাকে চিনত তারা বলত, ভাল্লুর মেজাজ খরগোসের চেয়েও ঠাণ্ডা! সে কোনদিন পালাবার চেষ্টা করে নি, কারুকে তেড়ে যায় নি, বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয় নি। কাজেই রক্ষক প্রায়ই খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই নিজের কাজকর্ম্ম সারত।

ভাল্লুর বাসা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে উপরে ছাদ ছিল না—তিন পাশে ছিল কেবল লোহার রেলিং। যেদিকে রেলিং ছিল না সেইদিকে ছিল একটি ছোট ঘর। রাতের বেলায় ভাল্লু এই ঘরে ঢুকে শুয়ে শুয়ে দেখত হরেক-রকম স্বপ্ন।

ভাল্লু যে রেলিংয়ের পাশে উপুড় হয়ে ছেলেবেলার স্বাধীনতার কথা ভাবছে, রক্ষক সেটা আন্দাজ

করতে পারলে না। সে ভিতরের ঘরটা ঝাঁট দিতে গেল।

খানিক পরে ঘর ঝাঁট দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে দেখে, খাঁচার ভিতরে ভাল্লু নেই। তাড়াতাড়ি খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়েও সে ভাল্লুকে দেখতে পেলে না।

খিদিরপুরের দিকে চিড়িয়াখানায় ঢোকবার যে ছোট দরজা আছে, ভাল্লু ততক্ষণে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চিড়িয়াখানার দুইজন কর্ম্মচারী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা দেখলেন একটা মস্ত-বড় ভীষণ ভল্লুক ছুটতে ছুটতে তাঁদের দিকেই আসছে!

সে-অবস্থায় প্রত্যেক ভদ্রলোকের যা করা উচিৎ, তাঁরা তাই-ই করলেন—অর্থাৎ বিনাবাক্যব্যয়ে এক এক লাফ মেরে দরজার বাইরে গিয়ে প'ড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথ খোলা পেয়ে ভাল্লু একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আজ এক বছর পরে রাস্তায় বেরিয়ে ভাল্লুর মনে আনন্দ আর ধরে না। এমনি কত রাস্তায় সে কত-না খেলা দেখিয়েছে—আহা, রাস্তা কি চমৎকার

জায়গা! সে আবার ধূলোয় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

একটি ফিট্‌ফাট মেম নাক শিকেয় তুলে চিড়িয়াখানার দিকে আসছিল। হঠাৎ মেমের সন্দেহ হ'ল, তার নাকের ডগায় ধূলো লেগেছে। সে তখনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে 'ভ্যানিটি ব্যাগে'র ভিতর থেকে বার করলে, পুঁচ্‌কে আরসি ও পাউডারের তুলি। তারপর একহাতে আরসি ও আর একহাতে তুলি ধ'রে নাকের ডগায় পাউডার মেখে সে চোখ নামিয়ে দেখলে এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন।

ভাল্লু আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষকে নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে দেখে নি। সে মেমের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক-বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল।

ঠিক্‌রে পড়ল মেমের হাত থেকে 'ভ্যানিটি ব্যাগ', পাউডারের তুলি ও সৌখীন আয়না! বিকট এক আর্ত্তনাদ এবং মূর্চ্ছিত মেমসায়েব পপাত ধরণীতলে!

এদিকে এক মিনিটের মধ্যে রাস্তা জনশূন্য! এক দল পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে এগিয়ে এল। কিন্তু ভাল্লু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিলে।

আগেই বলেছি ভাল্লু হ'চ্ছে বুদ্ধিমান জাম্ববানের বংশধর। হনুমানের বংশধর হয় হনুমান, জাম্ববানের বংশধরই বা জাম্ববান হবে না কেন? কাজেই তার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, চিড়িয়াখানার লোকেরা এখনি তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ছুটে আসবে।

কিন্তু সে আর চিড়িয়াখানায় ফিরে যেতে রাজী নয়। আজ সে হিমালয়ের স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে! আজ পেয়ে বসেছে তাকে পথের নেশা—পথের পর পথ, তারপর আবার পথ, নূতন নূতন দেশ আর পথ, পথ আর দেশ! তারপর সে হয়তো আবার খুঁজে পাবে তার সেই দূর-দূরান্তরে হারিয়ে-যাওয়া কত সাধের হিমালয়কে!

এখন, কেমন ক'রে মানুষদের চোখে ধূলো দেওয়া যায়?

ভাল্লু এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। মেমসায়েব শুয়ে শুয়ে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখেই আবার প্রাণপণে চোখ মুদে ফেললে।

সামনেই ছিল একটা মস্তবড় ঝুপ্‌সী গাছ। ভাল্লু চট্‌পট্‌ গাছে চ'ড়ে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই

সাহসিনী মিসেস্ দস্তিদার

দিব্য 'ব্ল্যাক-আউটে'র রাত। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু নামে মাত্র। চারিদিকের গাছ-পালা ও ঘরবাড়ী প্রভৃতিকে দেখাচ্ছে, কালো পটে আরো-কালো কালী-দিয়ে-আঁকা ঝাপ্‌সা ছবির রেখার মত।

কনষ্টেবল হনুমানপ্রসাদ পাঁড়ে রাস্তার ধারে একটি ভালো রোয়াক পেয়ে শুয়ে প'ড়ে মস্ত মস্ত মর্ত্তমান কদলী কিংবা ছাতু নুন ও কাঁচালঙ্কার স্বপ্ন দেখছিল নির্ব্বিঘ্নে।

হঠাৎ তার মুখের উপরে লাগল যেন একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা। স্বপ্ন হ'ল অদৃশ্য, নাসাগর্জ্জন হ'ল বন্ধ এবং তার বদলে দেখা গেল অন্ধকারেরও চেয়ে অন্ধকার ও প্রকাণ্ড কী যেন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার! তারই মধ্যে জ্বলছে আবার দু-দুটো আগুনের গুলি!

এও স্বপ্ন নাকি? কিন্তু এ-রকম স্বপ্ন হনুমানপ্রসাদ পছন্দ করত না। সে ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়ে চোখ পাকিয়ে দেখলে, একটা রীতিমত সচল অন্ধকার তার সামনে দাঁড়িয়ে হেলছে এবং দুলছে। আর সেই অন্ধকারটা যেন কেমন একরকম বোঁট্‌কা গন্ধের এসেন্স মেখে এসেছে!

ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি? চতুর্দ্দিক নিসাড় ও নিরাপদ দেখে আমাদের ভাল্লু বৃক্ষের আশ্রয় ছেড়ে মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হনুমানের নাসিকার হুঙ্কার শুনে সাগ্রহে ঘ্রাণ নিয়ে জানতে

এসেছে, এ আবার কোন্ দুষ্ট জানোয়ার তাকে দেখে কি টিট্‌কারি দিচ্ছে!

ম্লান আলোয় হনুমান সঠিক রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে না বটে, কিন্তু আন্দাজে এটুকু বেশ বুঝতে পারলে যে, তার সামনে যে আবির্ভূত হয়েছে সে একটা মূর্ত্তিমান বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হনুমান যখন ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করলে তখন তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে ভাল্লু একবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে উঠল।

পর-মুহূর্ত্তে হনুমান পাঁড়ে রোয়াকের উপর থেকে এমন এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করলে যে, আসল হনুমানরা পর্য্যন্ত তা দেখলে দস্তুরমত অবাক হয়ে যেত। তারপরই এক মাইলব্যাপী বিকট চীৎকার —"বাপ্ রে বাপ্, জান্ গিয়া রে জান্ গিয়া!"

ভাল্লু মাথা খাটিয়ে বুঝলে, এই চীৎকারের ফল ভালো হবে না। এখনি এ মুল্লুকের যত মানুষ ঘটনাস্থলে তদারক করতে আসবে এবং তারপর আবার তার গলায় পড়বে দড়ি। ভাল্লু তার চারখানা পা যতটা পারে তাড়াতাড়ি চালিয়ে একদিকে ছুটতে সুরু করলে।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! উত্তরদিকে দৌড়তে দৌড়তে হনুমান পাঁড়ে বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে, সেই অগ্নিচক্ষু অন্ধকারটা তাকে গ্রাস করবার জন্যে এখনো পিছনে পিছনে আসছে কিনা এবং দক্ষিণদিকে দৌড়তে দৌড়তে ভাল্লু বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে, তার হিমালয়ের স্বপ্নে বাদ সাধবার জন্যে মানুষেরা দড়ি নিয়ে বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটে আসছে কি না! তাদের দুজনেরই দৌড় দেখে বোঝা শক্ত, কে বেশী ভয় পেয়েছে!

পাহারাওয়ালা কত দূরে গিয়ে দৌড় থামালে জানি না, কিন্তু ভাল্লু আধঘণ্টার পর একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে হাঁপ ছাড়তে লাগল।

তখন রাত এসেছে ফুরিয়ে। পূর্ব্ব-আকাশে কে যেন কালোর সঙ্গে গুলে দিচ্ছে আলোর রং। ভোর হ'তে আর দেরি নেই দেখে ভাল্লু আবার একটা উঁচু ও ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিয়ে তড়্‌তড়্‌ ক'রে তার উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল। একদল কাক আর শালিখ পাখী তখন সবে জেগে উঠে প্রভাতী রাগিণী ভাঁজ্‌বার আয়োজন করছিল, আচম্‌কা দুঃস্বপ্নের মতন তাদের মধ্যিখানে ভাল্লুর

আবির্ভাব দেখেই তারা বেসুরো চীৎকার ক'রে যে যে-দিকে পারলো উড়ে পালালো।

ভাল্লু মনে মনে বললে, পাখীগুলো কেন যে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওরে কাক, ওরে শালিখের দল, তোরা আবার বাসায় ফিরে আয়। আমি যে পরম বৈষ্ণব, মাছ-মাংস স্পর্শ করি না! তার উপরে আমি দেখেছি হিমাচলের সুন্দর স্বপন—আমার মন ছুটেছে এখন অনন্ত হিমারণ্যের শীতল স্তব্ধতার দিকে, সেই যেখানে ঝরে তুষারের ঝরণা, বুনো বাতাস আনে অজানা ফুলের গন্ধ, গাছে গাছে ফ'লে থাকে পাকা পাকা মিষ্টি ফল! আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি দেশে চলেছি, আজ কি আমি জীব-হিংসা করতে পারি?···ভাল্লু ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছিল কি না হলপ্ ক'রে আমি বলতে পারি না, এ-সব আন্দাজ মাত্র। তবে সে কিছু-না-কিছু ভাবছিল নিশ্চয়ই এবং চার পা দিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ভোরের ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় কখন্ সে ঘুমিয়ে পড়ল।···

বেশ-খানিকক্ষণ পরে তার ঘুম গেল ভেঙে। পিট্-

পিট্ ক'রে চোখ মেলে নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখ্‌লে একটা দৃশ্য।

একটি বাগান। ভাল্লুর গাছটা বাগানের পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার আধাআধি ডালপালা শূন্যে বাগানের ভিতরদিকেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাল্লু যে মোটা ডালটাকে অবলম্বন করেছে সেটা আবার বেঁকে নেমে গিয়েছে বাগানের জমির কাছাকাছি।

সেদিন রবিবার। কলকাতার কোন মেয়ে-ইস্কুলের একদল ছাত্রী সেই বাগানে এসেছে বনভোজনে।

দশটি মেয়ে—বয়স তাদের বারো-তেরো থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে। সঙ্গে চারজন শিক্ষয়িত্রীও আছেন।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন মিসেস্ দস্তিদার। শুক্‌নো ও লিক্‌লিকে সরল কাঠের মতন তাঁর দেহ—মাথায় উঁচু সাড়ে পাঁচফুটেরও বেশী। পুরুষই হোক্ আর মেয়েই হোক্, এ-রকম রোগা চেহারায় যা সুলভ নয়, মিসেস্ দস্তিদার ছিলেন সেই বেজায় ভারিক্কে ভাবের অধিকারিণী। চশমা-পরা চোখে কড়া চাহনি, এবং একজোড়া পুরু ঠোঁটের উপরে উল্লেখযোগ্য একটি

গোঁফের রেখা। মেয়েদের ভিতরে একবার প্রশ্ন উঠেছিল, জীবনে হাসেনি এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে কিনা? উত্তরে একটি মেয়ে ব'লেছিল, "আছে। তাঁর নাম মিসেস্ দস্তিদার।"

তা মিসেস্ দস্তিদারের মুখে হাসির অভাব হ'লেও বাক্যের অভাব হয়নি কোনদিন। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই ফোটে কথার তুব্ড়ী এবং এ তুবড়ী মৌন হয়না এক মিনিটও। তাঁর বাক্যের স্রোত বন্যার মত ভেঙে প'ড়ে শ্রোতাদের কর্ণকুহরকে অভিভূত ক'রে দেয় এবং খানিকক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে বাধ্য হ'লে প্রত্যেক শ্রোতাই মনে মনে বলতে থাকে—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি! মিসেস্ দস্তিদারও সঙ্গে থাকবেন শুনে ইস্কুলের অধিকাংশ মেয়েই চাঁদা দিয়েও আজ বনভোজনে আসতে রাজি হয়নি।

গলা দিয়ে ফাটা কাঁসির মতন আওয়াজ বার ক'রে মিসেস্ দস্তিদার দস্তুরমতন ভারিক্কে-চালে বলছিলেন, "ইন্দু, অমন ক'রে আলুর দমের আলু কাটে না।—কি বললে? তোমার মা ঐ-রকম ক'রেই আলু কাটেন? তোমার মা তাহ'লে রান্না-বান্নার কিছুই বোঝেন না।.....শীলা, তুমি

হার্মোনিয়াম নিয়ে টানাটানি করছ কেন? গান গাইবে? কি গান? মনে রেখ, আমার সামনে তোমাদের একেলে ন্যাকা-ন্যাকা গজল কি ঠুংরি গাওয়া চলবে না। গান বলতে আমি কেবল বুঝি ব্রহ্মসঙ্গীত।.....(গলা চড়িয়ে) নমিতা, ঢালু-পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে তোমার ও কি হচ্ছে শুনি? যদি গড়িয়ে জলে প'ড়ে যাও? কি বললে? তুমি সাঁতার জানো? ওঃ সাঁতার জানলে মানুষ বুঝি জলে ডোবে না? অত আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই, শীগগির এখানে চ'লে এস! দুঃসাহস আর সাহস এককথা নয়। সাহস কাকে বলে আমার কাছ থেকে শুনে যাও। মিঃ দস্তিদার—অর্থাৎ আমার স্বামী 'ফরেষ্ট অফিসারে'র পদ পেয়ে প্রথম-প্রথম বড় ভয় পেতেন। তাঁকে সাহস দেবার জন্যে শেষটা আমাকেও বনে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। যে-সে বন নয়—যাকে বলে একেবারে গহন অরণ্য, দিনে-দুপুরে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায় শুয়ার, বরাহ, বাঘ, ভাল্লুক। কিন্তু আমার কিছুতেই ভয় হ'ত না, বাঘ-ভাল্লুককে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতুম না। বাঘ-ভাল্লুক—" বলতে বলতে হঠাৎ চম্‌কে থেমে গিয়ে

তিনি মাথার উপরকার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

ভাল্লু তখন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত লুব্ধ চোখে আহারের সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

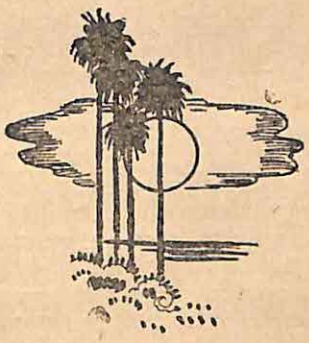

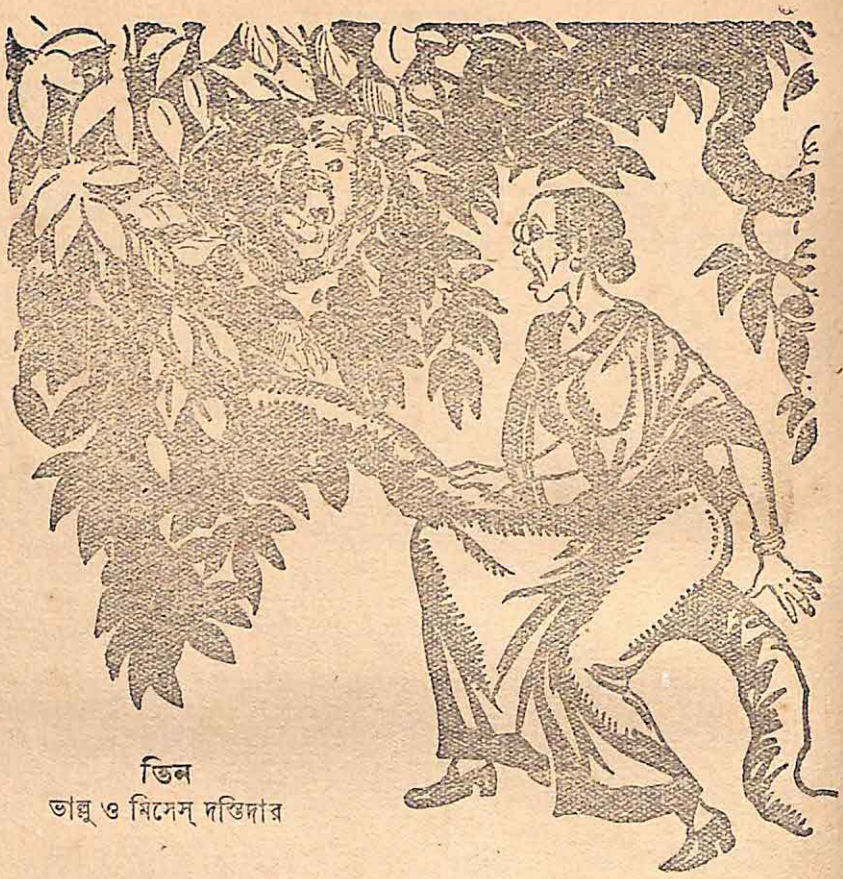

তিন
ভাল্লু ও মিসেস্ দত্তিদার

'ফরেষ্ট অফিসারে'র সাহসিনী গৃহিণী মিসেস্ দত্তিদার স্বামীর মনে সাহস সঞ্চার করবার জন্যে গভীর অরণ্যে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং গণ্ডার, বরাহ, বাঘ ও ভল্লুককে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতেন না, এ তথ্য তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর

মাথার উপরকার গাছের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভাল্লুর দাঁতবার-করা মুখখানা দেখেই তিনি যে-ব্যবহারটা করলেন তা অত্যন্ত অদ্ভুত ও কল্পনাতীত।

মিসেস্ দস্তিদার প্রথমটা ভাবলেন, তিনি একটা অত্যন্ত অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দর্শন করছেন। এটা সুন্দরবন বা হিমালয় বা সাঁওতাল পরগণার দুর্গম জঙ্গল নয়, এ হচ্ছে খাস কলকাতার কাছাকাছি সাজানো বাগান, এখানে স্বাধীন বাঘ-ভাল্লুকের আবির্ভাব হ'তে পারে না—কখনোই হ'তে পারে না!

এই ব'লে মিসেস্ দস্তিদার নিজের মনকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল না। কারণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঐ যে ভয়ঙ্কর মুখখানা বেরিয়ে আছে, ওটা একটা রীতিমত জ্যান্তো ভাল্লুকের মুখ ছাড়া আর কি বস্তু হতে পারে? মিসেস্ দস্তিদারের লেক্‌চার বন্ধ হয়ে গেল, সাতিশয় হতভম্ব হয়ে তিনি পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন।

ভাল্লু কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মিসেস্ দস্তিদারকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় নি। কাল থেকে তার পেটে এক টুক্‌রো খাবার বা একফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়ে নি,

কাজেই নিষ্পলক চোখে সে কেবল চড়ি-ভাতির খাবারগুলোর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

একটু পরেই ভাল্লু আর লোভ সামলাতে পারলে না, হঠাৎ তড়্‌বড়্‌ ক'রে গাছের উপর থেকে নেমে এল।

গাছের উপর থেকে যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক নেমে এল এ-সম্বন্ধে মিসেস্‌ দস্তিদারের আর কোন সন্দেহ রইল না।

মিসেস্‌ দস্তিদারের মুখের পানে তাকিয়ে ভাল্লু বললে, "ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!—অর্থাৎ "কিছু খাবার দেবে গা?"

কিন্তু মিসেস্‌ দস্তিদার ভাল্লুকের ভাষা শেখেন নি, কাজেই কিছু বুঝতেও পারলেন না। তবে ভাল্লুর "ঘোঁৎ" শুনে সাধারণ ভীরু নারীর মতন তিনি যে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন না, এইটুকুই তাঁর পক্ষে বিশেষ বাহাদুরির কথা। এমন কি তিনি উপস্থিত-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেললেন না। ভাল্লুর প্রথম 'ঘোঁৎ' শুনেই তিনি চম্‌কে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। বাগানের বাংলো অনেক দূরে এবং কাছাকাছি একটা গাছ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়ও নেই।

অতএব মিসেস্ দস্তিদার কালবিলম্ব না ক'রে সেই গাছের উপরেই চড়তে আরম্ভ করলেন।

নমিতা ছিল পুকুর-পাড়ে, সে ঝাঁপ খেয়ে ঝপাং ক'রে জলে গিয়ে পড়ল।

শীলা দেখালে আশ্চর্য্য তৎপরতা! কাছেই ছিল মালীর কুঁড়েঘর! সে যে কেমন ক'রে বেড়া বে'য়ে মালীর ঘরের চালের উপরে গিয়ে উঠল, কেউ এটা দেখবার সময় পেলে না।

আর আর মেয়েরাও "ওগো মাগো" বলে চেঁচিয়ে যে যে-দিকে পারলে স'রে পড়ল। কেবল ইন্দু আর নিভা পালাতে পারলে না, সেইখানেই ভয়ে কাবু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

ভাল্লু মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে প্রথমটা ভাবলে, 'আচ্ছা, এদের কাছে খাবার চাইলে পাওয়া যাবে কি?' তারপরেই তার মনে পড়ল, সে যখন পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়াত, দর্শকেরা তখন খুসি হয়ে তাকে ফল-মূল বকশিশ দিত। হয়তো তার নাচের কায়দা দেখে এরাও তাকে কিছু খাবার উপহার দিতে পারে। এই ভেবে ভাল্লু তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠেদাঁড়াল এবং ধেই-ধেই ক'রে ঘুরে-ফিরে নাচতে আরম্ভ করলে।

তার নৃত্য দেখেই ইন্দু আর নিভার স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল—তারাও প্রাণপণে দৌড় মারলে।

ওদিকে মেয়েদের চীৎকার শুনে কয়েকজন উড়ে মালী ছুটে এসে দেখে, চড়ি-ভাতির খাবার-গুলো নিয়ে একটা মস্তবড় ভাল্লুক যার-পর-নাই ব্যস্ত হয়ে আছে। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ভাল্লু তখন মনে মনে ভাবছে, তার নাচে মোহিত হয়েই মেয়েরা এত ভালো ভালো খাবার ছেড়ে দিয়ে গেল।

মিনিট-চারেকের মধ্যেই পায়েস, সন্দেশ ও রসগোল্লার হাঁড়ি খালি ক'রে ভাল্লু আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। থাবা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে একবার উপরপানে তাকিয়ে দেখলে।

মালীর ঘরের চালার উপরে ব'সে শীলা চেঁচিয়ে মিসেস্ দস্তিদারকে ডেকে বললে, "দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।"

মিসেস্ দস্তিদার আরো বেশী-উঁচু একটা ডালে গিয়ে উঠে ব'সে ভারিক্কে চালে বললেন, "তাকিয়ে থাকুক-গে। আমি ওকে ভয় করি না।"

শীলা বললে, "দিদিমণি, ভাল্লুকটা বোধহয় আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়।"

মিসেস্ দস্তিদার আরো বেশী গম্ভীর হয়ে বললেন, "শীলা, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?"

শীলা সকৌতুকে বললে, "না দিদিমণি, বলেন কি! আপনি যখন বনের গণ্ডার-বাঘ চরিয়ে এসেছেন, তখন এই সামান্য পোষা ভাল্লুকটা দেখে আপনি কি ভয় পেতে পারেন? কার সাধ্য এ কথা বলে।

মিসেস্ দস্তিদার বললেন, "শীলা আমি তোমার ঠাট্টার পাত্রী নই। কে তোমাকে বললে এ ভাল্লুকটা পোষা? ওর বড় বড় দাঁত আর নখ দেখেছ? ওর সয়তানি-মাখা চোখ দুটোও দেখ! এ হচ্ছে দস্তুরমত বন্য ভল্লুক, পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে।"

শীলা বললে, "ভাল্লুকটা সহরেই হোক্ আর বন্যই হোক্, ওকে দেখে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না।"

চশ্‌মার ভিতর থেকে মিসেস্ দস্তিদারের গোল গোল চোখ আরো ড্যাব্‌ডেবে হয়ে উঠল। বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, "ভয় হচ্ছে না মানে?"

শীলা বললে, "ভাল্লুকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে

না যে, ও এই খোলার চালটার ওপরে উঠতে চাইবে। ওরা গাছে চড়তেই ভালোবাসে।"

মিসেস্ দস্তিদার বললেন, "শীলা, তোমার চেয়ে দুষ্টু মেয়ে আমি দেখি নি। তুমি আবার আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ।"

শীলা খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "ঐ দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আবার গাছের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে!"

সত্যই তাই। একপেট খাবার খেয়ে ভাল্লুর মনে খুব ফুর্ত্তির উদয় হ'ল। তার সাধ হ'ল মিসেস্ দস্তিদারের সঙ্গে একটু খেলাধূলো করবে। সে আবার গাছের গুড়ি জড়িয়ে ধ'রে উপরপানে উঠতে আরম্ভ করলে।

ঘোড়ার উপরে লোকে যেমন ক'রে বসে, মিসেস্ দস্তিদার সেই ভাবে একটা ডালের উপরে ব'সে ধীরে ধীরে ডগার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তার ভাবভঙ্গি দেখে ভাল্লুর ভারি আমোদ হ'ল। সে মিসেস্ দস্তিদারের ডালের কাছে গিয়ে বললে, "ঘোঁৎ!"

সড়াৎ ক'রে মিসেস্ দস্তিদার আরো এক হাত স'রে গিয়ে একেবারে প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

ভাল্লুও জিভ দিয়ে নিজের নাক চাট্‌তে চাট্‌তে সেই ডাল ধ'রে এগুতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে মিসেস্ দস্তিদার ডাল ধ'রে ঝুলে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন, যা থাকে কপালে—এইবারে তিনি মাটির দিকে লাফ মারবেন। ভাল্লুকের ফলার হওয়ার চেয়ে হাত-পা ভাঙা ভালো।

ঠিক সেই সময়ে ভাল্লু দেখতে পেলে, দূর থেকে একদল লোক লাঠি-সোটা নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। সে বুঝলে, গতিক বড় ভালো নয়।

ভাল্লু তাড়াতাড়ি গাছের অন্যদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে পড়িল। তারপর সেখান থেকে একেবারে রাস্তার উপরে।

চার

নতুন-রকম লাঠি

ভাল্লু যেবিদায় নিয়েছে, মিসেস দত্তিদার তা দেখতে পেলেন না, কারণ পাছে তার কিম্ভূতকিমাকার হেঁড়ে মুখখানা আবার নজরে

প'ড়ে যায়, সেই ভয়ে তিনি প্রাণপণে দুই চোখ মুদে ফেলে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে দুই পা ছুঁড়ছিলেন ক্রমাগত।

কিন্তু ভাল্লুর পলায়ন আর কারুর নজর এড়ালো না। নমিতা সাঁতার-কাটা বন্ধ ক'রে ঘাটে এসে উঠল। শীলা মালীর ঘরের চাল থেকে চট্ ক'রে নেমে পড়ল। নিভা, ইন্দু প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েরাও কেউ গাছের গুঁড়ির আড়াল আর কেউ বা ঝোপঝাপ থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ডালে দোদুল্যমান মিসেস্ দস্তিদারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শীলা বললে, "আর দোল খাবেন না দিদিমণি! চোখ খুলে দেখুন, সেই পথভোলা ভাল্লুকটা আর এখানে নেই।"

মিসেস্ দস্তিদার তখনো চোখ খুললেন না। তার সন্দেহ হ'ল, দুষ্টু শীলা এখনো তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছে।

ইতিমধ্যে লাঠি সোটা নিয়ে পনেরো-ষোল জন লোক ঘটনাস্থলে এসে হাজির হ'ল। তারাও যখন অভয় দিলে, মিসেস্ দস্তিদার তখন অতি সন্তর্পণে চোখ খুলে সেই অবস্থায় যতটা-সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন।

শীলা বললে, "দিদিমণি, আপনি যে গভীর জঙ্গলে

গিয়ে এমন চমৎকার গাছে চড়তে আর এমন মজার দোলা খেতে শিখেছেন, আমরা কেউ তা জানতুম না। কি বলিস্, না রে নমিতা ?"

কিন্তু নমিতা হচ্ছে মুখচোরা মেয়ে, মনে মনে হেসেও মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না।

মিসেস্ দত্তিদার বেশ বুঝতে পারলেন, আজ যে অভাবনীয় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এর পরে আর প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবু অনেক কষ্টে নিজের কঠিন গাম্ভীর্য্য কতকটা বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রে তিনি বললেন, "আমার হাত দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে! আর আমি ঝুলতে পারছি না! শীগ্‌গির আমাকে নামিয়ে নাও, নইলে আমি ধপাস্ ক'রে প'ড়ে যাব!"

সকলে মহা সমস্যায় প'ড়ে গেল, কেমন ক'রে মিসেস্ দত্তিদারকে গাছ থেকে আবার মাটির উপরে ফিরিয়ে আনা যায়? খানিকক্ষণ পরামর্শের পর দুজন লোক লম্বা দড়ি নিয়ে গাছের উপরে গিয়ে উঠল। আরো খানিকক্ষণ চেষ্টার পর তারা মিসেস্ দত্তিদারকে দুই বাহুমূলে দড়ির বাঁধন লাগিয়ে তাঁকে আবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পাঠিয়ে দিলে।

আমরা খবর পেয়েছি, সেইদিনই বাগান থেকে

ফিরে এসে মিসেস্ দস্তিদার তিন মাসের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। অন্তত কিছুকালের জন্যে তিনি আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে রাজি নন।

যারা লাঠি-সোটা নিয়ে এসেছিল ভাল্লুর খোঁজে, তারা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে ভাল্লু-বেচারী একটু বিপদে পড়েছে। সে মনসা গাছ চিনত না। পাঁচিলের উপর থেকে সে যেখানে লাফিয়ে প'ড়েছিল সেখানে ছিল মস্ত-বড় একটা মনসার ঝোঁপ। সুতরাং তার অবস্থা বুঝতেই পারছ! যদিও বড় বড় ঘন লোম থাকার দরুণ তার দেহের অনেক জায়গাই মনসা-কাঁটার খোঁচা থেকে বেঁচে গেল, তবু তার নাকের ডগায় এবং চার পায়ের তলায় বিঁধে গেল অনেকগুলো মনসা-কাঁটা!

ভাল্লু রক্তাক্ত নাকের ডগায় থাবা ঘষ্‌ছে, জিভ দিয়ে পায়ের তলা চাট্‌ছে আর মনে মনে বলছে, "এ কি-রকম গাছ রে বাবা! একসঙ্গে এতগুলো কামড় মারে! হুঁ, এ গাছটাকে ভালো ক'রে চিনে রাখা দরকার—ভবিষ্যতে যেখানে এমন সর্ব্বনেশে গাছ থাকবে সেদিক আর মাড়াব না!"

হঠাৎ গোলমাল শুনে ভাল্লু চম্‌কে মুখ তুলে দেখে,

বাগানের লাঠিধারী লোকগুলো আবার তার দিকে ছুটে আসছে।

ভাল্লু তখন মরছে কাঁটার জ্বালায়, তার উপরে আবার এই নূতন বিপদ দেখে তার মেজাজ গেল চ'টে। সে বুঝল এরা তাকে ধরতে পারলেই ফের সেই চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে—হিমালয়ে যাবার পথ যেখানে লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ। সে তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সামনের দুই থাবা নেড়ে নিজের ভাষায় আস্ফালন ক'রে বললে, "আয় না মানুষের বাচ্চারা,—বুকের পাটা থাকে তো এগিয়ে আয়!"

কিন্তু তার চমকপ্রদ হুঙ্কার শুনে এবং রোমাঞ্চকর মুখভঙ্গি দেখে বুদ্ধিমান মানুষের বাচ্চারা আর অগ্রসর হ'ল না। কয়েকজন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকজন দৌড় মেরে আবার বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ভাল্লু বুঝলে এই কাপুরুষদের দেখে তার কোনরকম ভয় পাবার দরকার নেই। সে তখন আবার ব'সে প'ড়ে আড় চোখে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই নিজের আহত থাবাগুলো চাটতে লাগল।

তার দুটো পায়ের ভিতরে দুটো মনসা-কাঁটা ঢুকে ব'সে গিয়েছিল।

এমন সময়ে অন্য কোন বাগান থেকে খবর পেয়ে একজন বন্দুকধারী লোক সেখানে ছুটে এল। কিন্তু তাকে দেখেও ভাল্লুর ভাবান্তর হ'ল না, তার কারণ সে এখনো বন্দুককে চেনবার সুযোগ পায় নি। সে ভাবলে, ও-লোকটার হাতে যা রয়েছে তা একটা নতুন-রকম লাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়!

কিন্তু সেই নতুন-রকম লাঠিটা যখন দপ্ করে জ্ব'লে উঠে বেয়াড়া এক গর্জন করলে, ভাল্লুকে তখনি চার পা তুলে তড়াক্ ক'রে লাফ মেরে রীতিমত আর্ত্তনাদ করতে হ'ল।

ভাগ্যে বন্দুকটা ছিল পাখীমারা, তার ভিতরে বুলেটের বদলে ছিল ছর্‌রার কার্ত্তুজ! কতকগুলো ছর্‌রা মাটির উপরে ছড়িয়ে প'ড়ে ধূলো ওড়ালে, কতকগুলো তার লোমের আবরণ ভেদ করতে পারলে না এবং একটা তার বাঁ-কানকে ফুটো ক'রে দিলে!

ভাল্লুর পক্ষে তাইই যথেষ্ট হ'ল। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে বেগে পলায়ন করলে। পিছন থেকে আবার

সেই নতুন-রকম লাঠির গর্জ্জন শোনা গেল, তার কানের কাছ দিয়ে কতকগুলো কি সোঁ সোঁ ক'রে চ'লে গেল এবং সেও নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগল, "বাপ্ রে বাপ্, এ কোন্ আজব দেশে এসে পড়লুম? মানুষের মেয়ে এখানে গাছে উঠে ডাল ধ'রে দোল খায়, গাছ এখানে কামড় মারে, লাঠি এখানে বিদ্যুৎ জ্বেলে ধম্‌কে ওঠে, আর কী যে ছুঁড়ে কান ফুটো ক'রে দেয়, কিছুই বোঝা যায় না! হিমালয়ের পথে যে এত বাধা, সেটা তো জানা ছিল না, এখন মানে মানে দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই যে বাঁচি!"

ভাল্লু দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছেই—বিশেষ ক'রে নতুন-রকম লাঠি দেখে তার পেটের পিলে চম্‌কে গেছে দস্তুরমত! অনেক পথ, অনেক গ্রাম পার হয়ে, তবু সে থামতে রাজি নয়! যেখান দিয়ে সে যাচ্ছে সেখানেই উঠছে হৈ-হৈ রব! একজন সাইকেলের আরোহী বেশী ব্যস্ত হয়ে পালাতে গিয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে খেলে প্রচণ্ড আছাড়, একখানা গরুর-গাড়ীর গরু দুটো মহা ভয়ে দৌড়তে লাগল 'রেসে'র ঘোড়ার মত, ছেলেরা কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে, মেয়েরা আঁৎকে মূর্চ্ছা যায়,

স্বপন-বিভোল

ভাল্লু

* *
*

অথর্ব্ব বৃদ্ধরাও দৌড়-বাজিতে হারিয়ে দেয় জোয়ান যুবকদের! এমন-কি একটা এক-ঠেঙো খোঁড়াও অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়ে একটা খুব-উঁচু বটগাছের মগ্-ডালে না ওঠা পর্য্যন্ত থামল না।

ছুটতে ছুটতে ভাল্লুর দম বেরিয়ে যাবার মত হ'ল। হঠাৎ সামনে একখানা বাড়ী দেখে সে স্থির করলে, তার ভিতরই আশ্রয় নেবে।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই উঠান। উঠানের এক কোণের এক ঘরে ব'সে একটা উড়িয়া বামুন উনুনে কি তরকারি রাঁধছিল। আচমকা স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলদেহ এক ভাল্লুক! পরমুহূর্ত্তেই সে "হা জগড়্নাথ্অ" ব'লে দাঁতকপাটি লেগে চিৎপাত হয়ে একেবারে অজ্ঞান!

খাবার দেখেই ভাল্লুর পেটে ক্ষিধে আবার চোঁ-চোঁ ক'রে উঠল! সে গুটি-গুটি এগিয়ে একখানা থালা থেকে কি-একটা তরকারি একগ্রাস তুলে নিলে।— ওরে বাবা রে, কি ভয়ঙ্কর ঝাল রে! মনসার কাঁটা এবং বন্দুকের ছর্‌রাও যা পারে নি, তরকারির লঙ্কা করলে তার সেই দুর্দ্দশাই! সে ঘরের মেঝেয় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগল।

হঠাৎ দুম্ ক'রে একখানা প্রকাণ্ড থান-ইঁট এসে পড়ল তার পিঠের উপরে। "ঘোঁৎ-ঘুঁৎ" (অর্থাৎ "কে রে") ব'লে চেঁচিয়ে ভাল্লু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই মেঝের উপরে কেবল উড়িয়া বামুনটার অচেতন দেহ ছাড়া।

আসল কথা হচ্ছে, বাড়ীরই একজন লোক জান্‌লা দিয়ে ইঁটখানা ছুঁড়েই লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু ভাল্লু ভাবলে, এও একটা আজ্‌গুবি কাণ্ড! কেউ কোথাও নেই—ইঁট ছোড়ে ঘর! কে কবে এমন কথা শুনেছে? আরে ছোঃ, এমন জায়গায় কোন ভদ্র ভাল্লুকের থাকা উচিত নয়!

ভারি বিরক্ত হয়ে ভাল্লু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল!

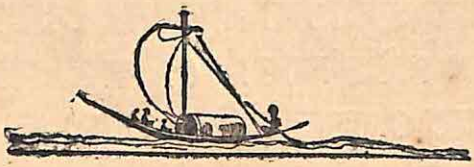

পাঁচ
ভোট-বিভ্রাট

কলকাতা থেকে কিছু দূরে ছিল একটি সহর, তার নাম আমি বলব না।

সেইখানে আজ মিউনিসিপালিটির কমিশনার না চেয়ারম্যান কিংবা জেলাবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা অন্য কিছু নির্ব্বাচনের জন্যে মহা ধূমধাম প'ড়ে গিয়েছে। ধূমধামের কারণটা বলি।

সহরে বাস করতেন মুকুন্দপুরের জমিদারদের দুই

তরফ—বড় এবং ছোট। বড় তরফের নাম আনন্দ চৌধুরী। জ্ঞানে, চরিত্রে ও সহৃদয়তায় তাঁর মতন লোক ও-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। লোকের উপকার করবার সুযোগ পেলে আনন্দবাবু নিজেকে ধন্য ব'লে মনে করতেন। আর লোকের উপকার করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে।

ছোট তরফের সাধুচরণ চৌধুরী ছিলেন ঠিক উল্টো-রকম মানুষ। 'সাধু' নামের এমন অপব্যবহার আর কখনো হয় নি। সাধু তামাক খেতে শিখেছিলেন গোঁফ গজাবার অনেক আগেই—অর্থাৎ এগারো উৎরে বারোয় পা দিয়েই। জীবনে তিনি কখনো একটিমাত্র আধ্‌লাও দান করেন নি—অথচ নানানরকম বদ্‌-খেয়ালীতে উড়িয়ে দিয়েছেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। শোনা যায় একবার এক বিড়ালের বিয়েতে তিনি নাকি পনেরো হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। নিষ্ঠুরতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মা ছেলের অসৎ ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন ব'লে নিজের মাকেও তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে। তাঁর লেখাপড়ার কথা না বলাই ভালো—কোন-

রকমে তিনি নিজের নামটি সই করতে পারতেন মাত্র।

আনন্দ ছিলেন সাধুর খুড়তুতো ভাই। আনন্দকে সবাই শ্রদ্ধা করত ব'লে সাধুর মন জ্বল্‌ত দারুণ হিংসার আগুনে। আনন্দকে জব্দ ও লোকের চোখে খাটো করবার জন্যে সর্ব্বদাই তিনি হরেক-রকম ফন্দি আঁটতেন। সেইজন্যেই নির্ব্বাচন-ব্যাপারে তিনি হয়েছেন আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধুর চেহারাও তেমনি। তাঁর ঘাড়ে-গর্দ্দানে, বিশাল ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে-সেটে কালো-কুচ্‌কুচে মূর্ত্তিখানি দেখলেই চোখ বুঁজে ফেলবার ইচ্ছা হয়। তাঁর কেশহীন মাথাটি কুম্‌ড়োর মতন তেলা, ঠোঁট দু'খানা কাফ্রীর মতন পুরু, নাক এত-বেশী চ্যাপ্টা যে দেখলে মনে পড়ে ওরাং উটাংকে, এবং গর্ত্তে-বসা চোখ দুটো হচ্ছে রীতিমত কুৎকুতে।

তা ব'লে তোমরা কেউ যেন সাধুকে বোকা ঠাউরে বোসো না। তাঁর ঘটে এটুকু বুদ্ধি ছিল যাতে-ক'রে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে বৈধ সৎ-উপায়ে আনন্দের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করা অসম্ভব। লোকে আনন্দকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ঘৃণা করে।

দেশের একদল উঁচা লোক করত সাধুর মোসাহেবি। ভোটারদের কাছে গিয়ে তারা রটিয়ে বেড়াতে লাগল, যারা সাধুর পক্ষে ভোট দেবে তারা প্রত্যেকেই ভোটের এক হপ্তা আগে থেকে রোজ এক-টাকার মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লা উপহার পাবে এবং ভোটের দিন সকালে সাধুর বাড়ীতে তাদের জন্যে হবে যে বিরাট ভোজের আয়োজন, তার মধ্যে থাকবে পূরো একশো রকম চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।

আনন্দের কানেও এ-খবর উঠতে দেরি লাগল না। তিনি আরো শুনলেন, অধিকাংশ ভোটারই সাধুর পাঠানো দৈনিক মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করছে এবং অনেকে আবার খাবারের বদলে নিচ্ছে একটি ক'রে নগদ টাকা!

আনন্দ মনে মনে দুঃখিত হ'লেন মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখে। দেশের ভালোর জন্য কত কাল ধ'রে তিনি কত কাজ করেছেন, আজ সামান্য জল-খাবারের লোভেই লোকে তা ভুলে গেল! বুঝলেন, এ-যাত্রায় তাঁর পরাজয় অনিবার্য্য।

ভোটের দিন দুপুর-বেলায় সাধুর বাড়ীতে পড়ল শত শত পাত। একশো রকম খাবারকে হস্তগত

করবার জন্যে প্রত্যেক লোককে আসন থেকে হাত বাড়িয়ে রীতিমত হামাগুড়ি দিতে হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেক ভোটারের ভুঁড়ি এত ভারি আর ডাগর হয়ে উঠল যে, সাধুর প্রশস্ত বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপরে ঘণ্টা-দুই চিৎপাত হয়ে বিশ্রাম না ক'রে কেউ আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারলে না।

ওদিকে আনন্দের বাড়ী দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন নীরবে কাঁদছে! সেখানে না আছে ভিড়, না আছে গোলমাল।

ভোটের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সাধু খুব জমকালো গরদের জামা-কাপড়-চাদর প'রে মোসাহেবদের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে মোটরে গিয়ে উঠলেন। মোটরখানা লতাপাতা-ফুল দিয়ে সাজানো, তাঁর হাতেও জড়ানো বেলের গোড়ে এবং তিনি কপালে পরেছিলেন মা-কালীকে পূজো দিয়ে মস্ত একটি সিঁদুরের ফোঁটা।

যেখানে ভোট নেওয়া হচ্ছিল, মোটর সেই মণ্ডপের দিকে চলল। সাধুর দলের কর্ম্মীরা তাঁকে দেখে জয়নাদ ক'রে উঠল।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল মোটরে চ'ড়ে আনন্দবাবুও ঘটনাক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি একলা। তাঁকে দেখে কেউ জয়ধ্বনিও করলে না।

একগাল হেসে নিজের মোটর থেকে সাধু চেঁচিয়ে বললেন, "আনন্দদাদা, খামোকা মন খারাপ করবার জন্যে কেন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছ বল দেখি? এবারে তোমার কোন আশাই নেই!"

আনন্দ বললেন, "জানি ভাই, জানি। ধ'রে নাও আমি বেরিয়েছি তোমাকেই অভিনন্দন দেবার জন্যে।"

আনন্দের গাড়ী এগিয়ে গেল।

সাধুর এক মোসাহেব বললে, "দেখছেন কর্ত্তা! আনন্দবাবু ভাঙবেন তবু মচ্‌কাবেন না। আবার আপনাকে ঘুরিয়ে ঠাট্টা ক'রে যাওয়া হ'ল!"

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সাধু বললেন, "রোসো না, আগে ভোটাভুটির হাঙ্গামটা চুকে যাক্, তারপর—ওরে বাপ্‌রে বাপ্! ও আবার কে রে?"

মোসাহেবদেরও চক্ষু ছানাবড়া!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ভোটের মণ্ডপের খানিক আগেই পথের পাশে ছিল একটা ছোটখাটো জঙ্গল।

হিমালয়ের যাত্রী শ্রীমান্ ভাল্লু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় হৈ-চৈ আর অসম্ভব লোকের ভিড় দেখে ঐ জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একে বহুক্ষণ আহারাদির অভাবে তার পথশ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়েছে, তার উপরে তার সূক্ষ্ম ভল্লুক-নাসা তাকে খবর দিলে যে, খুব কাছেই কোথায় হরেক-রকম খাবার-দাবার অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত্ত উদরের জন্যে ;—কাজেই ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে জঙ্গল ছেড়ে তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

পর-মুহূর্ত্তে সাধুর মোটরখানা বোঁ-বোঁ ক'রে একেবারে তার উপরে এসে পড়ল—তাকে চাপা দেয় আর কি!

কিন্তু হিমালয়ের ভাল্লুক এত সহজে মোটর-চাপা পড়বার জন্যে জন্মায়নি। একলাফ মেরে সে মোটরের সামনের দিকে উঠে পড়ল—কিন্তু ইস্। এখানটা যে আগুনের মতন গরম! তড়াক্ ক'রে আর এক লাফ —ভাল্লু হাজির হ'ল মোটরের ছাদে। গাড়ীর ছাদে একটা স্বাধীন ও বন্য ভাল্লুক নিয়ে কোন অতি-সাহসী লোকও মোটর চালাতে পারে না। কাজেই ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-চাঁ চম্পট! সাধুর তিন

মোসাহেবও বিনাবাক্যব্যয়ে মোটরের দরজা খুলে হুড়মুড় ক'রে রাস্তার উপরে ঝাঁপ খেলে এবং দেখতে দেখতে তারাও অদৃশ্য। সাধুর আর্ত্তনাদ তারা আমলেও আনলে না।

সাধুও এই বিপদজনক গাড়ীখানা ত্যাগ করবার জন্যে চট্‌পট্‌ গাত্রোত্থান ক'রেই সভয়ে চোখ পাকিয়ে দেখলেন, ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাল্লু তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। অমনি তিনি ধপাস্‌ ক'রে আবার ব'সে প'ড়ে কেঁদে উঠলেন, "ওগো মাগো।"

তারপরেই হ'ল একটা আরো ভয়ানক কাণ্ড। ভাল্লুর বিপুল ভার সইতে না পেরে সাধুর মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়ল।

ভাল্লুও ভয়ে আঁৎকে উঠে দুই হাত—অর্থাৎ সামনের দুই পা বাড়িয়ে একটা কিছু ধরতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে সাধুচরণকেই এবং তারপর সেই অবস্থাতেই ট'লে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়ল।

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে ভাল্লু নিজের আলিঙ্গন থেকে সাধুকে মুক্তি দিলে। সাধু ভয়ে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠবার সময় পেলেন না,

নিজের গোলগাল বপুখানি নিয়ে পথের ধূলোর উপর দিয়ে ক্রমাগত গড়াতে আর গড়াতে সুরু করলেন, তারপর অদৃশ্য হ'লেন পথের পাশে পচা জলের খানায়।

ভাল্লু চম্‌কে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার একটুও লাগেনি। তার নাসিকা তখন খাবারের সুগন্ধ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে!

ভোট-মণ্ডপের একপ্রান্তে সাধুচরণ নিজের পক্ষের ভোটারদের লোভ দেখাবার জন্যে বৈকালী জলযোগের যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, সুগন্ধ আসছিল সেইখান থেকেই। ভাল্লুর সুচতুর নাসিকা পথনির্দ্দেশ করলে,—সে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। ভোটমণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হবামাত্র সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকের ভিড় দেখে। কিন্তু তীক্ষ্ণনেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রেও সে যখন কারুর হাতে সেই নতুন-রকম লাঠি দেখতে পেলে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে চলল দ্বিগুণ বেগে।

ওদিকে একটা বিরাট ভাল্লুককে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে দেখেই দিকে দিকে রব উঠল—"মা রে, বাবা রে, পালা রে, খেলে রে।" এক মিনিটের মধ্যে

ভোটমণ্ডপ জনশূন্য হয়ে গেল। তারপর সাধুর খাবারগুলো যে কার বিপুল উদর-গহ্বরে স্থান-লাভ করলে, সেটা বোধ হয় আর ব'লে দিতে হবে না!

সাধু ভাল্লুকের ভয়ে কিছুকাল আর বাড়ীর বাইরে পা বাড়ান নি। ভোটের ফলাফল যখন বেরুলো তখন তিনি জানলেন যে, ভোটাররা তাঁর খাবার খেয়ে পেট ভরিয়েছে বটে, কিন্তু ভোট দিয়েছে আনন্দ চৌধুরীকেই। সুতরাং এ-যাত্রা সাধুচরণের হ'ল 'লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং'।

দিনের বেলায় যেখান দিয়ে যায় সেইখানেই নতুন নতুন গোল-

যোগের সৃষ্টি হয় দেখে ভাল্লু স্থির করেছে, এবার থেকে রাত না এলে সে আর পথের উপরে পদার্পণ করবে না।

অতএব যতক্ষণ দিনের আলো জ্বলত সে কোন ঝোপঝাপের ভিতর গিয়ে আড্ডা গাড়্‌ত। কখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে পিছনের পা-দুটোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত, কখনো চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবত তার সাধের হিমালয়ের কথা।

রাতের অন্ধকারে আবার আরম্ভ হ'ত তার যাত্রা। ক্ষুধা পেলে ফলমূল সংগ্রহ করত, তেষ্টা পেলে পাওয়া যেত নদী বা পুকুরের জল। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় তার খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা একটুও ছিল না বটে, কিন্তু কোন-কোনদিন পেটভরা খাবার না জুটলেও চিড়িয়াখানায় ফিরে যাবার কথা ভুলেও সে ভাবতে পারতো না। স্বাধীনতা যে কত মিষ্টি, ভাল্লু ভালো ক'রেই অনুভব করতে পেরেছে।

এক রাতে ভাল্লু হেলে-দুলে মনের সুখে পথ চলছে, হঠাৎ এল ঝম্-ঝম্ ক'রে জল। সে তখন একটা নিঃসাড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ভাল্লু অন্ধকারেও চোখ চালাতে পারত, চারিদিকে তাকিয়ে একটা মাথা গোঁজ্‌বার যায়গা খুঁজতে লাগল। তারপর একখানা বাড়ীর দেওয়ালের তলার দিকে মস্ত-একটা গর্ত্ত দেখে সুড়্-সুড়্ ক'রে সে তার ভিতর গিয়ে ঢুকল।

ঢুকে দেখে বাঃ, দিব্যি একটি শুক্‌নো খট্-খটে ঘর। সে ভাবতে লাগল, 'মানুষরা তাদের বাড়ীর

চারিদিকের দেওয়ালেই বড় বড় গর্ত কাটে বটে, কিন্তু গর্তগুলো আবার লোহার ডাণ্ডা বসিয়ে এমন ভাবে আগ্‌লে রাখে যে, মাথা গলাবার ফাঁক-টুকুও পাওয়া যায় না। খামোকা এ-রকম গর্ত কেটে বোকামি করবার কারণ কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু এ-গর্তটা তো সে-রকম নয়! এতে লোহার ডাণ্ডা বসানো নেই, এর ভিতর দিয়ে মুণ্ডুর সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই ধড়টা গলিয়ে ফেলা গেল। নিশ্চয় এ হচ্ছে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কীর্ত্তি।'

ভাল্লুর আন্দাজ মিথ্যা নয়। এ গর্তটা কেটেছে দুজন অতি-বুদ্ধিমান মানুষ, তাদের নাম সোনা ও মোনা। এ-অঞ্চলের চোরেদের সর্দ্দার হচ্ছে সোনা মোনা, দেওয়ালে সিঁধ কেটে তারা ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়ীতে।

নিশুত্‌ রাত, তার উপরে বাদ্‌লার ঠাণ্ডা পেয়ে বাড়ীর লোকরা আরামে ঘুম দিচ্ছে, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে নাসা-যন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পূজা-মন্ত্র। সোনা-মোনা নির্ব্বিবাদে কাজ সারলে। সোনার হাতে টাকা ও গহনার বাক্স এবং মোনার হাতে একখানা কাপড়ে বাঁধা এক কাঁড়ি রূপোর গেলাস-বাটি-থালা।

তারা যে-ঘরে সিঁধ কেটেছিল সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মোনা চুপিচুপি বললে, "দাদা, আজ মার্ দিয়া কেল্লা!" সোনা বললে, "চুপ্! আগে বাইরে যাই, তারপর কথা!"

পা টিপে টিপে তারা ঘরের ভিতরে ঢুকল।

অম্‌নি ভাল্লু বললে, "ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ'—অর্থাৎ 'তোমরা আবার কে বট হে?'

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। তোমরা বোধ হয় ভাবছ, ভাল্লুর এক 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ' শব্দের রকম-রকম মানে হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে, বাঘ ভাল্লুক শৃগাল কুকুর বিড়াল প্রভৃতির, এবং পক্ষীদেরও শব্দ-ভাণ্ডারে আমাদের মতন বেশী শব্দ নেই। অধিকাংশ সময়েই তারা একই রকম শব্দ করে বটে, কিন্তু উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে সেই একই রকম শব্দের অর্থ হয় ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, কুকুর ডাকে ঘেউ-ঘেউ ক'রে কিন্তু শত্রুকে দেখলে সে ঘেউ-ঘেউ ক'রে বলে—'ভাগো হিঁয়াসে, নইলে কামড়ে দেব!' আর মনিবকে

দেখলেও ঐ এক ঘেউ-ঘেউ রবেই জানায়—'এস প্রভু, আমি তোমার পা চেটে দি!'

অন্ধকারে ভাল্লুর সম্ভাষণ শুনেই সোনা-মোনা ভয়ানক চম্‌কে গেল।

মোনা 'টর্চ্চ্' জ্বেলেই 'ই-হি-হি-হি-হি' ব'লে চীৎকার ক'রে চিৎপটাং! তারপর একেবারে অজ্ঞান! তার হাতের রূপোর বাসনগুলো মেঝের উপরে ছড়িয়ে প'ড়ে বেজে উঠল ঝন্-ঝনা-ঝন্!

সোনাও ভাল্লুর বিপুল মুখখানা দেখতে পেলে। সে অজ্ঞান হয়ে গেল না বটে, কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

তোমরা ভাল্লুকের জ্বর দেখেছ? যখন-তখন ভাল্লুকদের দেহে একরকম কাঁপুনি আসে এবং খানিক পরেই আবার তা থেমে যায়;—একেই বলে ভাল্লুকের জ্বর! সে সময় তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, তারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে!

সোনার কাঁপুনি দেখে ভাল্লুও ভাবলে, লোকটার দেখছি আমারই মতন জ্বর এসেছে! সহানুভূতি-মাখা-স্বরে 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ' ক'রে সে বলতে চাইলে, 'ভয় নেই ভায়া, ও-রকম জ্বর বেশীক্ষণ থাকে না!'

কিন্তু তার কথা শুনে সোনার কাঁপুনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল।

তাকে ভালো ক'রে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভাল্লু কয় পা এগিয়ে গেল।

অমনি ছুটে গেল সোনার আচ্ছন্ন-ভাবটা। সে বিকট স্বরে "ওরে বাবা রে, গেছি রে" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে ঘরের বাইরে মারলে এক লাফ!

ইতিমধ্যে সোনার চীৎকারে ও বাসন ফেলে দেওয়ার শব্দে বাড়ীশুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছে এবং চারিদিকে ছুটাছুটি করছে লোকজন—বাড়ীর উপরে-নীচে জ্ব'লে উঠেছে অনেকগুলো লণ্ঠন!

সোনা ভারি হুঁসিয়ার চোর। ভাল্লু-কে দেখেও সে গহনার বাক্স ছাড়ে নি। তার আবির্ভাবে 'চোর, চোর' রব জাগল এবং উঠানে লোকের ভিড় দেখে সে তড়্-বড়্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির মুখে দোতালায় দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং। তিনি বামাল-সমেত সোনাকে গ্রেপ্তার করলেন।

সোনা কর্ত্তার দুই পা জড়িয়ে ধ'রে কাকুতি-মিনতি

ক'রে বললে, "হুজুর! আমাকে মারুন ধরুন, থানায় দিন—কিন্তু আর ভাল্লুক লেলিয়ে দেবেন না। চোর ধরবার জন্যে আপনারা ভাল্লুক পুষেছেন জানলে আমরা কি আর এ-বাড়ীতে পা বাড়াতুম?"

কর্ত্তা মহা বিস্ময়ে বললেন, "ভাল্লুক! কোথায় ভাল্লুক?"

আচম্বিতে উঠানে আবার রব উঠল—"ভাল্লুক, ভাল্লুক!" চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

লোকেরা জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলো উঠানেই ফেলে রেখে গেল। উঠানের উপরে দাঁড়িয়েছিল কেবল কর্ত্তার ছোট ছেলে খোকাবাবু—বয়স দেড় বৎসর।

কর্ত্তা স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক খোকার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল।

এদিকে খোকার কিন্তু ভয়-ডর কিছু নেই। সে কুকুর ভারি ভালবাসত এবং ভালু-কে ঠাউরে নিলে বোধহয় বড়জাতের কোন কুকুর ব'লেই। সে রাঙা রাঙা ঠোঁটে ফিক্-ফিক্ ক'রে হেসে, নধর নধর হাত

দুখানি নেড়ে ভাল্লু-কে ডাকতে লাগল—"আয়, আয়, আয়!"

ভাল্লু যখন পথে পথে নর্ত্তক-জীবন ও চিড়িয়াখানায় বন্দীজীবন যাপন করত, তখনি সে আবিষ্কার করেছিল একটি মস্ত-বড় সত্য! মানুষদের খোকা-খুকীরা তাকে যত ভালবাসে ও আদর করে, এত আর কেউ নয়! আজ পর্য্যন্ত সে যত খাবার বখ্‌শিশ পেয়েছে, তার বেশীর-ভাগই এসেছে খোকা-খুকীদের নরম নরম হাত থেকে। তাই সে খোকা-খুকী দেখলেই নিজের বিশেষ বন্ধু ব'লে মনে করত।

আজও সবাই যখন ভয় পেয়ে লম্বা দিলে, তখন এই নির্ভীক ছোট্ট খোকাটির সাদর আহ্বান শুনে ভাল্লুর মন বড় খুসি হয়ে উঠল। সে তখনি খোকার পায়ের তলায় চার পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে প'ড়ে আনন্দে গদ গদ হয়ে একবার এপাশে, আর একবার ওপাশে ফিরতে লাগল।

খোকাও তার পাশে ব'সে একবার ফিক্ ক'রে হাসে এবং একবার কচি-কচি হাত বাড়িয়ে ভাল্লুর বড়-বড় লোম গুছি ক'রে ধ'রে টান মারে!

এদিকে খোকার মা ভয়ে প্রথমটা পালিয়ে গেলেও ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যে আবার উঠানের উপর ছুটে এসে, ব্যাপার দেখে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

ভাল্লু তখন তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

খোকার মা ভরসা পেয়ে বললেন, "কী ভালো-মানুষ ভাল্লুক গো!"

সিঁড়ির উপরে কর্ত্তাও তখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন! ভয় বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তিনি বললেন, "কিন্তু আমার বাড়ীতে ভাল্লুক এল কোথা থেকে?"

সিঁধেল সোনা তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। সে বললে, "হুজুর, ঐ ঘরে আমরা সিঁধ কেটেছি। সিঁধের গর্ত্ত দিয়ে ঐ বনের ভাল্লুকটা নিশ্চয় বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে!"

ভাল্লুক কারুকে আক্রমণ করে না, উল্টে পোষা কুকুরের মতন খেলা করে দেখে বাড়ীর লোকরা আবার উঠানের আনাচ-কানাচ থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। খোকার মা ছেলেকে কোলের

কাছে টেনে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

কর্ত্তা সোনাকে চাকরদের হাতে সমর্পণ ক'রে নীচে নেমে সিঁধের ঘরে ঢুকলেন। তখনো সোনার ভির্মি ভাঙেনি। সেও ধরা পড়ল। সিঁধের গর্ত্তটা পরীক্ষা ক'রে তিনি ঘরের বইরে এসে সানন্দে বললেন, "আমার সর্ব্বস্ব যেতে ব'সেছিল, ভাগ্যে ঐ কাদের পোষা ভাল্লুক এসে চোর ধরেছে, তাই আবার সব ফিরে পেলুম!"

খোকা মায়ের কোল থেকে ভাল্লুর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আবার খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

কর্ত্তা বললেন, "এই ভাল্লুকটিকে আমি পুষ্‌ব, ও আমার খোকার খেলার সাথী হবে।"

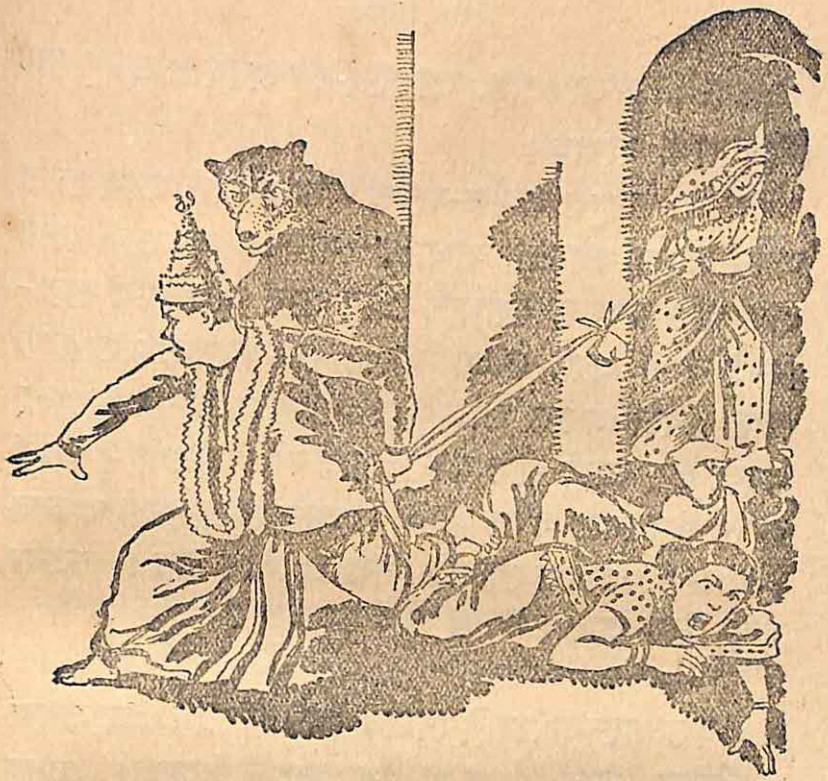

সাত
গাঁটছড়ার 'টাগ্-অফ-ওয়ার'

বড়ই বিপদ, বড়ই বিপদ! যে-বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাই আবার সেই বন্ধন?

ভাল্লুর মুখ শুকিয়ে গেল মনের অসুখে।

ভাল্লু-কে পুষেছেন খোকার বাবা। তাঁর কুকুর

ছিল, এখন ম'রে গেছে, তারই শিকল দিয়ে ভাল্লু-কে বেঁধে রাখা হয়েছে।

যদিও ভাল্লুর আদর-যত্নের অভাব নেই, তার জন্যে আসে ভালো ভালো খাবার, খোকার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, খোকন এসে তার সঙ্গে প্রায় সারা-দিনই কথা কয়, খেলা করে, সে-পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও তার চারিপাশ ঘিরে খেলাধূলো করে, তবু ভাল্লু খুসি হ'তে পারে না। মুখখানি বিমর্ষ ক'রে চুপ মেরে ব'সে থাকে। আর খেলাধূলো করবে কি, দু পা এগুতে গেলেই শিকলে পড়ে টান! গলায় দড়ি দিয়ে কার খেলার সাধ হয় বল?

হপ্তাখানেক এমনি গেল। সন্ধ্যাবেলা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। খোকা ঘুমোতে গিয়েছে। ভাল্লু একলা।

উঠোনের চারিধারে ঘর—কোনদিকেই চোখ ছোটাবার উপায় নেই। ভাল্লু যেদিকে তাকায় দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই দুঃখ ভাল্লু-কে আরো কাতর ক'রে তোলে।

কেবল উপর-দিকটা খোলা। মুখ তুললে দেখা

যায়, তারার চুম্‌কি বসানো নীলাকাশের খানিকটা, আর একখানি বড় চাঁদ।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেললে কিনা জানিনা, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। চাঁদ দেখলে জীবজন্তুদের মনে কি-রকম ভাবের উদয় হয়, আমার পক্ষে তা বলা অসম্ভব। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। চাঁদনী-রাতে পথের কুকুরগুলোর চীৎকার বড় বেড়ে ওঠে। কিন্তু কেন? কুকুররা চেঁচিয়ে চাঁদকে কি বলতে চায়?

ভাল্লু কি ভাবছিল? হয়তো সে ভাবছিল যে, হিমালয়ের দিকে গিয়েছে যে-পথ, এই চাঁদ তার উপরেও ফেলেছে রূপোলী আলো। পথের ধারে ধারে হাওয়ার দোলায় দুলছে নীল বন, চন্দ্রকিরণ জ্বলছে তার পাতায় পাতায়। সেখানে চোখ ছোটে দিকে দিকে সুদূরে, নড়্‌লে-চড়্‌লে বাজে না শিকলের বেসুরো সঙ্গীত। সেখানে যত-খুসি ছুটোছুটি কর, কোন পাঁচিল, কোন বন্ধ দরজা, কোন বাঁধন, বাধা দেয় না। ভাবতে ভাবতে ভাল্লুর মনটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল। তার ভাবটা তখন বোধহয় এইরকম—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায় ?"

ঐ তো সদর-দরজাটা এখনো খোলা রয়েছে! ঐ দরজার ওপারেই তো স্বাধীনতার পথ! একবার যদি শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারি তাহ'লে আর আমাকে পায় কে? কুকুরবাঁধা শিকল যে ভাল্লুকের পক্ষে নগণ্য, বাড়ীর কর্ত্তা সেটা খেয়ালে আনেন নি।

ভাল্লুর এক টানে ঝনাৎ ক'রে ছিঁড়ে গেল শিকল! ভাল্লু মারলে দোড়! যে-সে দৌড় নয়—যাকে বলে ভোঁ-দোড়!

গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠ পার হয়ে বন, বন পার হয়ে একটা নদী।

ভাল্লু মনের সুখে খানিকক্ষণ নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল। তার সাড়া পেয়ে একটা কুমীর ভেসে উঠে তদারক করতে এল। ভাল্লু মুখ খিঁচিয়ে তাকে দিলে এক জোর ধমক। শিকারটা সুবিধা-জনক নয় বুঝে কুমীর আবার ডুব মারলে। এবং ভাল্লুও বুঝলে, যেখানে জলে বেড়ায় প্রকাণ্ড টিক্‌টিকি সে-ঠাঁই মোটেই নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে উঠল।

তার পরেই ভাল্লুর নাকে এল একটা মিষ্টি সুগন্ধ —অর্থাৎ খাবারের গন্ধ।

এখানেই তার দুর্ব্বলতা। তাকে অনায়াসেই পেটুক-চূড়ামণি উপাধি দেওয়া যেতে পারে। নাকে খাবারের গন্ধ এলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—তার ভরা পেটেও জেগে ওঠে নতুন ক্ষুধার তাড়না!

শূন্যে নাক তুলে সে অগ্রসর হ'তে লাগল। একটা গ্রামে ঢুকল। গ্রামের এক বাড়ীতে আজ বিয়ের ঘটা। সাজানো আলোর মালা! লোকজনের ছুটোছুটি ও হাঁক-ডাক! লুচি-তরকারির গন্ধ!

বাইরের উঠানে বরযাত্রীরা আসর জাঁকিয়ে ব'সে আছে। পান-তামাক নিয়ে চাকররা আনাগোনা করছে। বালকরা ফুলের মালা ও প্রীতি-উপহারের কবিতা বিতরণ করছে। একজন বড় ওস্তাদ তানপূরা কাঁধে নিয়ে, কানে এক হাত চেপে মস্ত-বড় হাঁ ক'রে পিলে-চম্‌কানো তান ছাড়ছেন আর সমঝদাররা তারিফ ক'রে বলছেন বাহবা-কি-বাহবা। এবং একদল ফাজিল ছেলে মাঝে মাঝে আড়াল থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—বাহবা-কি-ছ্যা-ছ্যা!

ভাল্লু কোনদিনই মানুষকে ভয় করত না ; কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে মানুষরাই তাকে যমের মতন ভয় করে। সুতরাং সে অম্লানবদনে গদাই-লস্করি চালে আসরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পর-মুহূর্তেই কি যে দক্ষযজ্ঞ ছত্রভঙ্গ কাণ্ড বাধল, সেটা তোমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারবে। বরযাত্রীরা পালালো পায়ের জুতো ফেলে, তানপূরাহীন ওস্তাদজী লম্বা দিলেন ওস্তাদি তান ভুলে, বরকর্তা পালাতে গিয়ে খেলেন ভীষণ আছাড় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর মনে পড়ল ভাল্লুকরা মরা মানুষ ছোঁয় না, সুতরাং দুই চোখ বুঁজে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে এমন ভাব দেখালেন, যেন তিনি ম'রে কাঠ হয়ে গিয়েছেন—যদিও মস্ত ভুঁড়ির হাপরের মতন হাঁপানি তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। আধ মিনিটের মধ্যেই আসর জনশূন্য ও শব্দহীন।

ভাল্লু দু-একগাছা ফুলের মালা শুঁকে বুঝলে, সেগুলো খাবার জিনিষ নয়। একটা ভরতি চায়ের পেয়ালায় জিভ ডুবিয়ে চাখ্‌লে, তাও অখাদ্য ব'লে মনে হ'ল। তার পরেই তাকে আহ্বান করলে ভিয়ান-ঘরের লুচি-তরকারির গন্ধ। সেই গন্ধের

উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে ভাল্লু আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

অন্দর-মহলের উঠান। দালানে ঠিক যেন একটি লাল চেলীর পুঁটলীর পাশে টোপর-মাথায় বর-বাবাজী ঘাড় হেঁট ক'রে বসে আছে, পুরোহিত করছে মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাদের ঘিরে গয়না ও রংচঙে কাপড়-পরা মেয়েদের ভিড়।

কনের মা বিন্দী-দাসীকে ডেকে বললেন, "ওরে, সদরে গিয়ে দেখে আয় তো, ওখানে অত হৈ-চৈ কিসের ?"

বিন্দী সদরের দিকে গেল এবং তারপরেই মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে দুই চোখ কপালে তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল এবং দুম্-দাম্ শব্দে সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কনের মা সবিস্ময়ে বললেন, "ওরে বিন্দী, কি হ'ল রে, হঠাৎ তুই ক্ষেপে গেলি নাকি ?"

বিন্দীর জবাব পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ভাল্লুর দেখা পাওয়া গেল।

পুরুত-ঠাকুর বুড়ো-থুথুড়ো হ'লেও অতি চটপটে,

তিড়িং ক'রে লাফ মেরে তখনি চম্পট দিলেন। বর রীতিমত হতভম্ব! তার পাশের পুটলীটা আশ্চর্য্য-রকম জ্যান্তো হয়ে উঠল!

বর-কনের পিছনকার দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা মস্ত কুলুঙ্গী। কনের বুঝতে দেরী লাগল না যে, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। সে টপ্ ক'রে গাত্রোত্থান করলে এবং ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া বরের দুই কাঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গীটার ভিতরে ঢুকে বসল। অন্যান্য মেয়েরাও যখন কলরব তুলে উধাও হ'ল, বরও তখন বুঝতে পারলে 'যঃ পলায়তি স জীবতি।'

কিন্তু পালাতে গিয়ে পড়ল গাঁটছড়ায় টান। বর গাঁটছড়া ধ'রে টান মারতেই কুলুঙ্গীর ভিতর থেকে কনেও গাঁটছড়ার অন্য প্রান্ত ধ'রে প্রাণপণে টেনে রইল। বরও ছাড়বে না, কনেও ছাড়বে না—সে এক অপূর্ব্ব 'টাগ্-অফ্-ওয়ার'!'

ভাল্লুর ভাব দেখলে বোধহয়, এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই যেন হয়নি! খাবারের গন্ধ তাকে ডাক দিয়েছে, কোনদিকে তাকিয়ে নষ্ট করবার মত সময়

তার নেই। ভিয়েন-ঘর খুঁজে বার করতে বিলম্ব হ'ল না।

সেখানেও হ'ল আর এক দফা হাঁউ-মাউ, হুটোহুটি, ছুটোছুটি, লুটোপুটির পালা! তারপর সব ঠাণ্ডা!

ভাল্লু তখন মনের সাধে বেছে বেছে খাবার খেতে বসল।

খেতে খেতে যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখন বাড়ীর ভিতরে কোথায় উপরি-উপরি দুইবার গুড়ুম গুড়ুম ক'রে বেজায় আওয়াজ হ'ল।

ভাল্লু চম্‌কে উঠল। ওরে বাবা, এখানেও নতুন-রকম লাঠির গোলমাল? মানুষগুলো কি পাজী, খেয়ে-দেয়ে যে একটু জিরিয়ে নেব তারও যো নেই!

ভাল্লু হন্তদন্তের মত সেখান থেকে স'রে পড়ল।

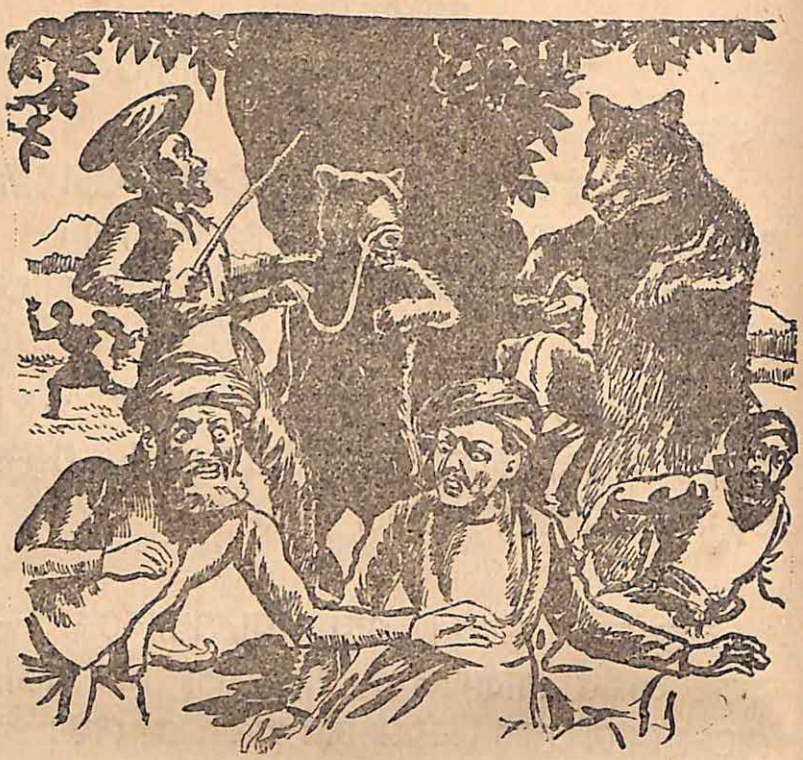

আট
বনের বাঘা

জ্বালালে রে, ভারি জ্বালালে! যেখানে যাব, সেখানেই ঐ নতুনরকম লাঠি গুড়ুম-গুড়ুম ক'রে আক্কেল-গুড়ুম ক'রে দেবে?

ভাল্লু পাঁই পাঁই ক'রে ছুটতে লাগল। অত বড় এবং ভারি দেহ নিয়ে কি ক'রে যে সে অত

তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, সে কথা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়!

আবার গ্রামের পর গ্রাম, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ, নদীর পর নদী। মাথার উপরে সোনার চাঁদ খালি হাসে আর হাসে, পরীদের উড়ন্ত ফানুসের মতন জোনাকীরা টিপ্ টিপ্ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে 'কা-হুয়া, কা-হুয়া' ব'লে চেঁচিয়ে শেয়ালরা খবরদারি করতে আসে।

স্বাধীন ভাবে পথ-চলার আনন্দে ভাল্লুর মন যখন রীতিমত মেতে উঠেছে, বনের ঝোপ নেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো হাম্‌দোমুখো বাঘা।

ভাল্লু থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। ভাল্লুও আড়-চোখে তাকে দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে, এ জীবটিকে বৈষ্ণব ব'লে সন্দেহ হয় না।

বাঘা দু পা এগিয়ে এল।

ভাল্লু বললে, "ঘোঁৎ?" ("কে তুমি?")

বাঘা মাটিতে ল্যাজ আছড়ে বললে, "গর্‌র্ গর্‌র্ গর্‌র্!" ("আমি বাঘা। আপাততঃ তোমার ঘাড় মট্‌কাতে চাই!")

মাটিতে আছড়াবার মতন ল্যাজ ভাল্লুর ছিল না। তবু বাঘাকে ভড়কে দেবার জন্যে একটা-কিছু করা উচিত বুঝে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা নেড়ে নেড়ে বললে, "ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!" (মট্ ক'রে মট্‌কাবার মতন ঘাড় আমার নয়! তফাতে সরে যা হতভাগা!")

বাঘা মনে মনে তারিফ ক'রে বললে,—এই কুকুরমুখো ধিঙ্গীটা আমার ওপরে বেশ-এক-হাত নিলে দেখছি! আমি ল্যাজটা আছড়াতে পারি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে এমন মানুষের মতন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব!—প্রকাশ্যে বললে, "হালুম্ হলুম্, হালুম্ হলুম্!"

ভাল্লু বললে, "ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ ঘ্যাক্!"

বাঘা বললে, "রক্ত খাব!"

ভাল্লু বললে, "থাবড়ে বদন বিগড়ে দেব!"

—"আও, আও!"

—"নিকালো হিঁয়াসে!"

—"হোঁদল্-কুৎকুতে!"

—"থ্যাব্‌ড়ানাকী চেরণদাঁতী!"

তারপর বাক্যযুদ্ধের পালা সাঙ্গ। ভাল্লুর ঘাড়ে পড়বার জন্যে বাঘা মারলে লাফ—ভাল্লু গেল চট্ ক'রে একপাশে স'রে। বাঘা মাটিতে প'ড়েই ফিরে ঘ্যাক্ ক'রে ভাল্লুর পিছনে কামড়ে দিলে। ভাল্লুও ফিরে বাঘার মুখে মারলে ধাঁ-ক'রে এক-থাব্ড়া।

ভাল্লুর পিছনে ছিল পুরু লোম, বাঘার কামড়ে তার কিছুই হ'ল না। কিন্তু ভাল্লুর থাব্ড়ায় বাঘার বাহারি মুখের যে দুর্দশা হ'ল তা আর বলবার নয়।

তখন অরণ্য-রাজ্যের প্রজারা চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে মজা দেখবার জন্যে। শিয়াল, বন-বিড়াল, সজারু এবং গাছের ডালে লাঙ্গুল ঝুলিয়ে তিনটে হনুমান। এমন-কি একটা ভীতু খরগোসও গর্তের ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি না মেরে থাকতে পারলে না। মজা দেখতে এলো না কেবল হরিণরা।

এর আগে বাঘা কোনদিন ভাল্লুক দেখেনি, কারণ ভাল্লুকরা এ বনে বসবাস করত না। আজ প্রথম ভাল্লুকের পরিচয় পেয়ে সে দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গেল।

ভাল্লু বললে, "ভায়া, আর এক হাত লড়াই করবে নাকি ?"

বাঘার গা যেন জ্ব'লে গেল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে সে আবার ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

শেয়ালরা সুধোলে, "কা হুয়া, কা হুয়া ?"

"কুছ্ নেহি হুয়া" ব'লে ভাল্লু আবার চলতে সুরু করলে।

চাঁদের আলোয় ধব্ ধব্ করছে বনের পথ। পাপিয়ারা মেতেছে গানের জলসায়। নিঝুম রাতের কানে কানে বাতাস বাজাচ্ছে সবুজ পাতার বীণা। পথের শেষে ঘাস-বিছানায় শুয়ে একটি নদী কল-তানের ছন্দে গাঁথছিল হীরার মালা।

ভাল্লুর তেষ্টা পেয়েছে। সে নদীর ধারে গিয়ে চুক্-চুক্ ক'রে জলপান করছে, এমন সময়ে এখানেও একটা কুমীর তার সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু ভাল্লু জলে নামলে না। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় মানুষদের ঘরের দেওয়ালে আমি তো অনেক টিক্‌টিকি দেখেছি, কিন্তু জলের টিক্‌টিকিগুলো এত বড় হয় কেন ?

কুমীরটা প্রায় তীরের কাছে এসে বললে, "ভালুক-ভায়া, একবার জলে নামো না হে! তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই।"

ভাল্লু বললে, "না হে ধুম্‌সো টিক্‌টিকি, আমার সময় নেই।"

—"এত ব্যস্ত কেন? কোথা যাও?"

—"ক্ষিধে পেয়েছে। বটতলায় চললুম বটফল কুড়িয়ে খেতে।"

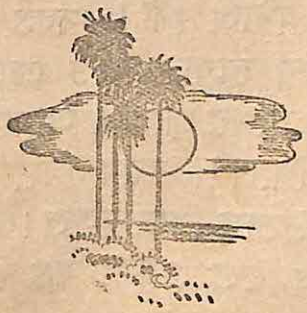

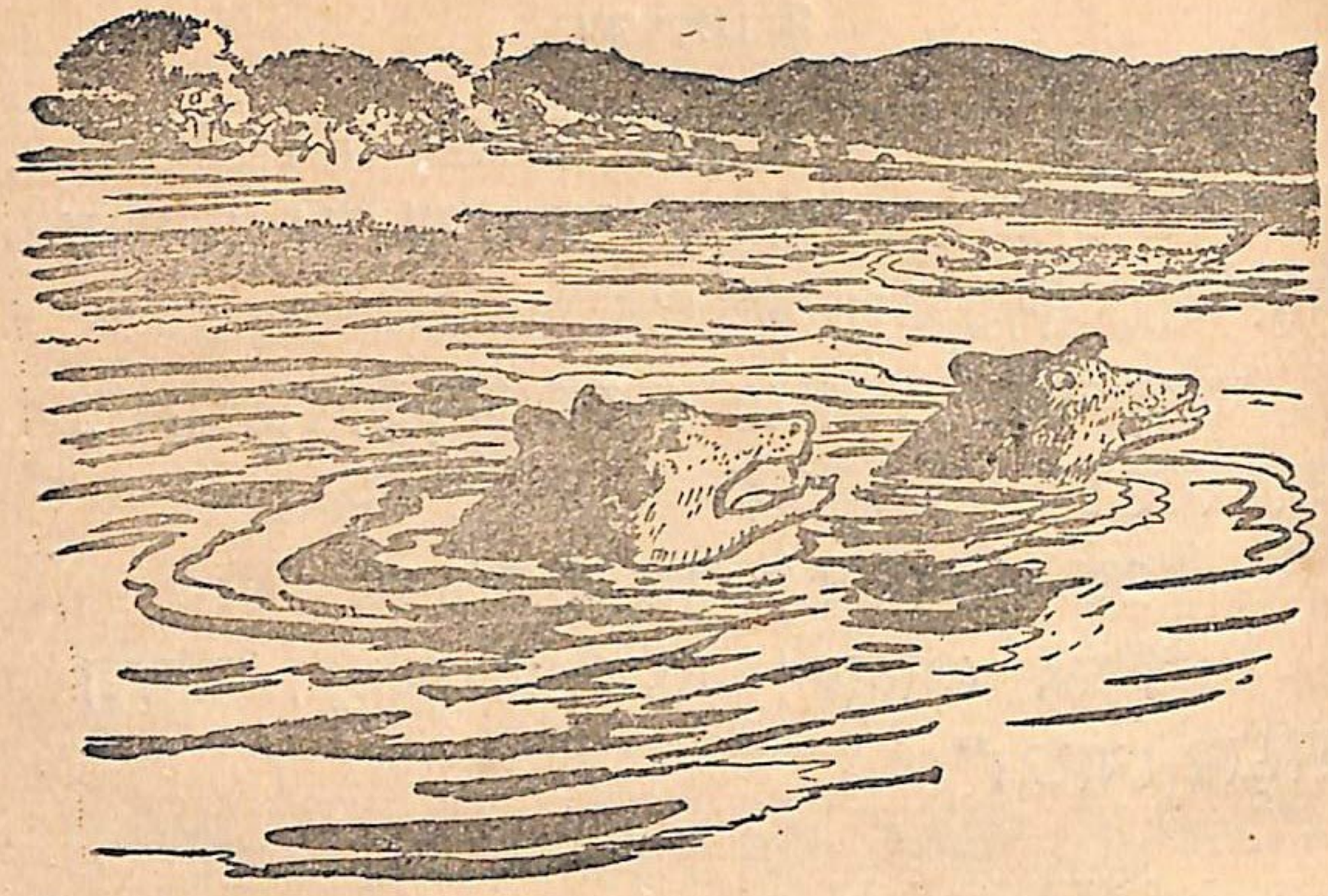

নয়

কালুয়া-সুন্দরী

বটগাছের ঝিল্‌মিলে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ হাসিমুখে উঁকি মেরে দেখলে, ভাল্লু মনের সাধে কুড়িয়ে খাচ্ছে মাটির উপরে ঝ'রে-পড়া বটের ফল।

তারপর চাঁদ নিলে ছুটি। সমস্ত পৃথিবী পড়ল অন্ধকারের ঢাক্‌না চাপা,—শূন্যে জেগে রইল খালি তারা-ছড়ানো আকাশের মায়াময় আবছায়া।

ভাল্লুর ঘুম পেলে। নরম বিছানার খোঁজে সে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার আগেই ঢুকে ঘুমোচ্ছিল একটা মস্ত গোখ্‌রো সাপ,

ভাল্লুর সাড়া পেয়ে সে কালো বিদ্যুতের মত মাথা তুলে ব'লে উঠল "ফোঁস্, ফোঁস্! রোস্ তো, রোস্ তো,—দেখ্‌বি মজা—রোস্ তো, রোস্ তো! ফোঁস্!" সাপ মারলে ছোবল, কিন্তু তার আগেই চটপটে ভাল্লু চালালে থাবা, গোখ্‌রোর বিষ-দাঁত শুদ্ধ মুণ্ডু গেল কোথায় উড়ে। ভাল্লু একটু তফাতে গিয়ে থেব্‌ড়ি খেয়ে ব'সে দেখতে লাগল, গোখ্‌রোর মুণ্ডহীন লট্‌পটে ধড়টা ক্রমাগত পাকসাট মারছে আর পাক খাচ্ছে। ভাল্লু অবাক হয়ে ভাবলে, এ কি-রকম জানোয়ার রে বাবা! মাথা না থাকলেও মরবার নাম করে না! আবার তেড়ে কামড়াতে আসবে নাকি? দরকার নেই এখানে ঘুমিয়ে, অন্য ঝোপে যাওয়া যাক!...

পূব-আকাশে রামধনু-রঙের খেলা দেখে পাখীরা খুসি হয়ে ঘুম-ভাঙানিয়া তান সাধতে লাগল, কিন্তু ভাল্লুর ঘুম তবু ভাঙল না। গেল রাতে তার কম খাটুনি হয় নি তো, স্বপ্নলোক থেকে সে সহজে ফিরে আসতে রাজি হ'ল না।

বেলা বাড়ছে, চাষারা মাঠে মাঠে লাঙল চষ্‌ছে, ক্ষেতের আশপাশ দিয়ে হাটের লোক আনাগোনা করছে!

সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুর মত গেল বদ্‌লে। মনে মনে সে বললে "আহা মরি মরি, ভল্লুকীর কি সুন্দর দেহের গড়নটি! মাঝে মাঝে নাচের তাল কেটে যাচ্ছে বটে—তা একটু-আধটু তাল অমন কেটেই থাকে, কিন্তু কি চমৎকার ওর নাচের ধরণটি! ওগো ভাল্লু-মেয়ে, তুমি হিমালয়ের কোন্ বনের ঋক্ষরাজ-কুমারী? কোন্ পামর মানুষ তোমাকে বাপ-মায়ের আদর-ভরা কোল থেকে ছিনিয়ে এনে এমন পথের ধুলোয় নামিয়েছে? হায় হায়, কত কষ্টই পাচ্ছ না জানি!"

হঠাৎ বোধ হয় নাচের তাল বেশী রকমই কেটে গেল, ভাল্লুকওয়ালা লাঠি তুলে ভল্লুকীর নাকের উপরে ঠকাস্ ক'রে এক ঘা বসিয়ে দিলে। ভল্লুকী কেঁদে উঠল, তার কান্নার আওয়াজ শাঁখের ডাকের মত!

ভাল্লুক-মেয়ের গায়ে হাত তোলা? এ নিদারুণ দৃশ্য ভাল্লু সহ্য করতে পারলে না, ভয়ঙ্কর এক গর্জ্জন ক'রে সে একেবারে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

যারা একমনে নাচ দেখবার আমোদে মেতেছিল,

সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনে বেজায় চম্‌কে তারা ফিরে দেখে, ঝোপ ভেদ ক'রে ছুটন্ত বিভীষিকার মত আবির্ভূত হয়ে একটা সুবৃহৎ ভাল্লুক বেগে তেড়ে আসছে তাদের দিকেই! গ্রামের প্রান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনাতীত ব'লে প্রথমটা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে দু-এক মুহূর্ত্ত সকলে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত; এবং তারপরেই হাঁউ-মাঁউ ক'রে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে টেনে লম্বা দিলে।

ভাল্লুকওয়ালাদের ব্যবসা ভাল্লুক নিয়ে, কাজেই প্রথমটা সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে নড়তে রাজি হ'ল না।

কিন্তু ভাল্লু যখন কাছে এসে মানুষের মতন দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, সামনের দুই পায়ের নখ-বার-করা থাবা বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হ'ল, তখন ভল্লুকীর বাঁধন-দড়ী ছেড়ে বিকট চীৎকার ক'রে সেও দিলে চোঁচা চম্পট!

ভাল্লু খানিকদূর পর্য্যন্ত ভাল্লুকওয়ালার পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে গেল। তারপর ফিরে আবার গদাইলস্করী চালে ভল্লুকীর দিকে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভল্লুকী মাটিতে চার থাবা পেতে ব'সে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে ভাল্লুকে ভ্যালো ক'রে দেখে নিয়েছে এবং বলতে কি—তাকে তার পছন্দও হয়েছে!

ভাল্লু কাছে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ ধ'রে ভল্লুকীকে মুগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করলে। তারপর এগিয়ে ভল্লুকীর ঠাণ্ডা নাকে নিজের ঠাণ্ডা নাক ঘ'সে মধুর স্বরে বললে, "ঘোঁৎ, ঘোঁৎ!"

ভল্লুকীও লজ্জিত চোখ নামিয়ে মেয়েলী মিহি গলায় বললে, "ঘোঁৎ ঘোঁৎ!"

তারপর তাদের দুজনের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হ'ল, আমার বিশ্বাস তা হচ্ছে এইরকম:

ভাল্লু বললে, "ওগো রাজকন্যে, তোমার নাম কি, তোমার বাসা কোন্ বনে?"

ভল্লুকী মাছি তাড়াবার জন্যে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, "জানি না। জ্ঞান হবার আগেই উনুনমুখো মানুষরা আমাকে ধ'রে এনেছে।"

—"মানুষরা তোমার কোন নাম রাখে নি?"

—"ওমা, তা আবার রাখে নি! মানুষরা আমাকে কালুয়া ব'লে ডাকে।"

—"কালুয়া! আ মরি মরি, কী মিষ্টি নাম!" ভাল্লু দুই চোখ মুদে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

ভল্লুকী খুসি হয়ে সুধোলে, "বীরবর, তোমার নামটি তো শোনা হ'ল না!"

ভাল্লু ভরাট্ গলায় বললে, "আমার নাম ভাল্লু।"

—"ভাল্লু? হুঁ, যোদ্ধার মতন নামই বটে!...ঘ্যাক্, ঘ্যাক্—ঘোঁক্?"

—"ওকি?"

—"এক ঝাঁক মাছি গো! তিনটেকে খেয়ে ফেলেছি। বাকিগুলো ভারি জ্বালাচ্ছে।"

ভল্লুকীর মন রাখবার জন্যে ভাল্লু তখন মক্ষিকাদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বললে, "নাঃ, অসম্ভব! কাল আমি বনের বাঘার সঙ্গেও যুদ্ধে জিতেছি কিন্তু পাজীর পা-ঝাড়া এই উড়ন্ত শত্রুগুলো ধরাই দেয় না, যুদ্ধ করব কি? এক বেটা আবার আমার কানে ঢুকে 'বোঁ বোঁ' ব'লে গান গাইছে! রাজকন্যে, এখান থেকে স'রে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

দুজনে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে

ভল্লুকী বললে, "ক্ষিধের চোটে আমার নাড়ী চোঁ চোঁ করছে!"

ভাল্লু বললে, "বটফল খেতে চাও তো ঐ বটতলায় চল।"

বটফল খেতে খেতে ভল্লুকী বললে, "হ্যাঁগা, তুমি অমন ছট্‌ফট্‌ করছ কেন?"

—"বললুম তো কানে ঢুকেছে মাছি!"

—"কৈ, দেখি!"

ভাল্লু শুয়ে প'ড়ে মুখ কাৎ ক'রে রইল। ভল্লুকী তার কানের কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে হুস্‌-হুস্‌ ক'রে ছাড়তে লাগল প্রচণ্ড নিঃশ্বাস! মাছিটা টুপ্‌ ক'রে বেরিয়েই ভল্লুকীর বদন-বিবরে ঢুকে পড়ল।

ভাল্লু কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "কালুয়া-সুন্দরী, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?"

ভল্লুকী আনন্দে গদ্গদ হয়ে হেলে-দুলে বললে, "রাজি!"

ব্যাস্‌, তাদের বিয়ে হয়ে গেল! মানুষের বিয়ের মতন জানোয়ারদের বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষ কথা,

পুরুত, মন্ত্র, বরপণ ও আরো হাজার ঝঞ্ঝাটের দরকার হয় না —এ একটা মস্ত সুবিধা।

ঠিক এম্‌নি সময়ে দূরে উঠল একটা গোলমাল। নতুন বর-বউ চমকে ফিরে দেখে, শত শত লোক আকাশ-ফাটানো চীৎকার করতে করতে মাঠ দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে আসছে এবং সকলের আগে আগে আসছে সেই ভাল্লুকওয়ালা!

ভল্লুকী ভাল্লুর পেটের তলায় মুখ গুঁজে সভয়ে বললে, "ওমা, কি হবে গো!"

ভাল্লু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সদম্ভে বললে, "কুছ পরোয়া নেহি! মানুষের দাঁত নেই, গায়ে জোর নেই—ওদের আবার ভয় কি? মাছির মতন কানের মধ্যে ঢুকে ওরা বোঁ-ও-ও বলে গান গাইতেও পারে না! যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি!"

ভল্লুকী সাহস পেয়ে বললে, "বীরবর, তুমিই ধন্য!"

গুড়ুম্ গুড়ুম ক'রে বন্দুকের শব্দ হ'ল।

ভাল্লু বিনাবাক্যব্যয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে মাটিতে প'ড়ে চার পায়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

ভল্লুকী বললে, "তুমি কি ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ ?"

—"পাগল, আমি পালাচ্ছি।"

—"সে কি গো, আমাকে ফেলে ?"

—"উপায় কি গিন্নী, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি নতুন-রকম লাঠির শব্দ শুনেছি, আর কি এখানে থাকি ?"

নদীর ধারে গিয়ে ভাল্লু ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার সঙ্গ ছাড়ে নি। খুসি হয়ে বললে, "এই যে, তুমিও এসেছ, ভালোই হয়েছে। এখন জলে ঝাঁপ দাও তো দেখি! কিন্তু সাবধান, ধুম্‌সো টিক্‌টিকিকে কাছে ঘেঁসতে দিও না!"

—"ধুম্‌সো টিক্‌টিকি আবার কে ?"

জলে ঝাঁপ খেয়ে ভাল্লুক বললে, "ঐ দেখ।"

কিন্তু কুমীর-ভায়া হাঁদা-গঙ্গারাম নয়। এক সঙ্গে ডবল ভাল্লুক দেখে সে ডুব মেরে চ'লে গেল।

দশ

স্বপ্নভঙ্গ

ভাল্লু সাঁতার কেটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার পিছনে নেই, কখন্ জল থেকে উঠে গিয়ে চুপ ক'রে ডাঙার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল্লু চীৎকার ক'রে তাকে ডাকলে।

কিন্তু ভল্লুকী তবু সাড়া দিলে না।

ভাল্লু বুঝলে, নদীর জলে ধুম্‌সো টিক্‌টিকিকে দেখে ভল্লুকী ভয়ে ভড়্‌কে গিয়েছে! বউকে অভয় দেবার জন্যে ভাল্লু যখন ফির্‌ব ফির্‌ব করছে, তখন আবার গুড়ুম্ ক'রে বন্দুকের আওয়াজ এবং সোঁ ক'রে কি একটা জিনিষ এসে ভাল্লুর ঠিক পাশ দিয়ে জলের উপরে ছোঁ মেরে চ'লে গেল।

ভাল্লু বোকা নয়! নতুন-রকম লাঠির চীৎকার শুনেই কালুয়া-সুন্দরীর কথা ভুলে সে বেগে সাঁতার কাটতে সুরু করলে। মিনিট-কয় পরে ওপারে গিয়ে উঠে ফিরে দেখলে, ভাল্লুকওয়ালা এসে আবার কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাল্লু ধরলে বনের পথ।

* * *

* *

নয়নপুরের জমিদারের নাম প্রশান্ত চৌধুরী। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের ডাকনাম টুনু ও ঝুনু।

ঝুনু হচ্ছে দিদি, বয়স ছয় বৎসর। টুনুর বয়স চারের বেশী নয়।

ঝুনু একেবারে পাকা গিন্নিটি, এই বয়সেই তার নাকি কিছুই জানতে বাকি নেই! সে জানে আকাশের তারারা হচ্ছে চাঁদামামার খোকা-খুকী। ফুলপরীরা রাত্রে যে-সব ফানুষ উড়িয়ে দেয়, মানুষরা যে তাদেরই জোনাকী ব'লে ডাকে এ-বিষয়েও ঝুনুর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই! ঝুনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে বনগাঁবাসী মাসি-পিসির বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসে, তারপর সকালে সেখানকার গল্প ব'লে টুনুকে অবাক্ করে দেয়।

আজ সে হঠাৎ বললে, "টুনু, হরিণ দেখেছিস্?"

—"না।"

—"হরিণরা কোথায় থাকে জানিস্?"

—"উহুঁ!"

—"বনে।"

—"কোন বনে?"

—"মাঠের ওপারে যে বনটা দেখা যাচ্ছে, ঐ বনে।"

টুনু বললে, "আমি হরিণ দেখব।"

ঝুনু বললে, "হাঁটতে পারবি?"

—"হুঁ-উ-উ!"

—"তবে আয় আমার সঙ্গে।"

তেপান্তর মাঠ। যেখানে বনরেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে যেতে মাইল-তিনেক পথ পেরুতে হয়। পায়ে-হাঁটা মেঠো পথ ধ'রে এগিয়ে চলল ঝুনু আর টুনু।

মাইল খানেক পথ চলতে না চলতেই টুনু ব'সে প'ড়ে বললে, "দিদি আমায় কোলে নে।"

ঝুনু কি আর করে, টুনুকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু চার বছরের খোকাকে কোলে নিয়ে ছয় বছরের খুকী আর কতক্ষণ পথ চলতে পারে? খানিক পরেই হাঁপিয়ে প'ড়ে ঝুনুও পথের উপরে ব'সে পড়ল।

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালাচাঁদ মণ্ডল বা কালু-সর্দ্দার। সে হচ্ছে এ-অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের দলপতি। প্রথমেই তার শিকারী চোখ পড়ল ঝুনুর গলার সোনার হার ও হাতের সোনার চুড়ীর উপরে।

কালু গলার আওয়াজ যথাসাধ্য নরম ক'রে সুধোলে, "তোমরা কাদের খোকা-খুকী গো?"

ঝুনু বললে, "আমার বাবা জমিদারবাবু।"

—"এখানে কেন?"

—"ঐ বনে যাব।"

—"বনে গিয়ে কি করবে খুকুমণি ?"

—"হরিণ দেখব।"

—"ও, তাই নাকি ? তা হরিণ তো ও-বনে থাকে না !"

—"হরিণ তবে কোথায় থাকে শুনি ?"

খানিক দূরের একটা ছোট জঙ্গল দেখিয়ে দিয়ে কালু বললে, "ওখানে অনেক হরিণ আছে। দেখবে ?"

—"দেখব ব'লেই তো এসেছি !"

—"এস, তবে আমার কোলে ওঠ।"

ঝুনু আর টুনুকে নিয়ে কালু জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হ'ল।

এখন, সেই জঙ্গলেরই ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের ভাল্লু। একটা ঝুপ্‌সী ঝোপের তলায় ঢুকে সে তখন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তার কানে গেল শিশুর কান্না !

ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে ভাল্লু ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলে।

কালু তখন এক হাতে ঝুনুকে মাটির উপরে চেপে

ধ'রে আর এক হাতে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছে!

আগেই বলেছি আমাদের ভাল্লু প্রত্যেক খোকা-খুকীকে বন্ধু ব'লে মনে করত। এতটুকু একটি খুকীর উপরে এমন বিষম অত্যাচার সে সহ্য করতে পারলে না। ভয়ানক গর্জ্জন ক'রে তেড়ে গিয়ে কালুকে মারলে প্রচণ্ড এক চড়! কালু আর্ত্তনাদ ক'রে ঠিক্‌রে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কালুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ঝুনু ও টুনুর পিলে গেল চমকে। সামনে তাদের প্রকাণ্ড এক ভাল্লুক! সে আবার চড় মেরে মানুষকে রক্তাক্ত ক'রে দেয়! তারা দুজনেই কেঁদে উঠল।

ভাল্লু বুঝলে, তাকে দেখে শিশুরা ভয় পেয়েছে। সে তখন দুই পায়ে ভর দিয়ে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে আরম্ভ করলে—কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে, তাকে নাচতে দেখলেই শিশুরা হেসে উঠে খুসি হয়ে হাততালি দেয়।

যা ভেবেছে তাই! ভাল্লুক-নাচ দেখেই ঝুনু ও টুনু কান্না ভুলে গেল।

খানিকক্ষণ নাচানাচি ক'রে ভাল্লু মাটির উপরে

লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে ঝুনু ও টুনুর পায়ের কাছে গিয়ে, চার থাবা তুলে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

টুনুর মনে হ'ল, ভাল্লু যেন মিট্ মিট্ ক'রে তাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে হাস্‌ছে। সে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে হাত দিলে, ভাল্লু তবু নড়ল না। ঝুনু তখন সাহস সঞ্চয় ক'রে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, ভাল্লু তখনও আড়ষ্ট।

ঝুনু বললে, "ভাল্লুকটা ভারি ভালোমানুষ রে!"

টুনু বললে, "একে আমি পুষব।"

* * *

* *

জমিদার-বাড়ীতে তখন হুলুস্থূল প'ড়ে গিয়েছে—ঝুনু ও টুনুর অন্তর্ধানে চারিদিকে উঠেছে খোঁজ খোঁজ রব।

জমিদার প্রশান্ত চৌধুরী অনেক লোকজন নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে আছেন তাঁর বাল্যবন্ধু নবীনবাবু। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার একজন পদস্থ কর্ম্মচারী, ছুটি পেলে মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসেন।

একজন লোকের মুখে শোনা গেল, ঝুনু ও টুনুকে দেখা গিয়েছে মাঠের ধারে।

তারপর মাঠের এক চাষী খবর দিলে, কালু-সর্দ্দার দুটি শিশুকে কোলে ক'রে গিয়েছে জঙ্গলের দিকে।

ডাকাত কালু-সর্দ্দার? প্রশান্তবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দলবল নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলেন তিনি পাগলের মত।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল এক দৃশ্য—যেমন ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত!

একদিকে মাটির উপরে প'ড়ে রয়েছে কালুর রক্তাক্ত ও অচেতন দেহ, হাতে তার ঝুনুর সোনার হার।

আর একদিকে হেলে-দুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভাল্লুক, পিঠে তার ব'সে রয়েছে ঝুনু ও টুনু!

টুনু সকৌতুকে বলছে, "হট্ হট্ ঘোড়া, হট্ হট্! জোর্‌সে চল, জোর্‌সে চল।"

নবীনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আরে, এ যে আমাদের চিড়িয়াখানার সেই ভাল্লুকটা! আজ ক-দিন হ'ল পালিয়ে এসেছে!"

ভাল্লু বেগতিক দেখে ঝুনু ও টুনুকে পিঠে ক'রেই চম্পট দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু এবারে সে আর ফাঁকি দিতে পারলে না, মানুষের উপকার করতে গিয়ে আবার মানুষের হাতেই বন্দী হ'ল।

ঝুনুর মুখে সমস্ত শুনে প্রশান্তবাবু কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, "এই ভাল্লুকটি আমার ছেলে-মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছে। একে আমি যত্ন ক'রে বাড়ীতে রেখে দেব।"

নবীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। এই ভাল্লুকটি হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি। ওকে আবার যেতে হবে চিড়িয়াখানায়।"

হায় ভাল্লু! হায় রে হিমাচলের স্বপ্ন!

শেষ—
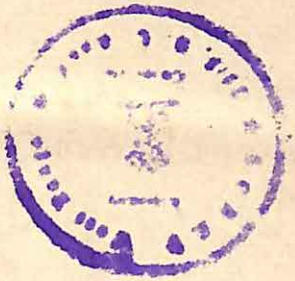
State Institute of Education
P.O. Banipur, 24 Parganas.
West Bengal.